চতুষ্কোণ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো।। কলকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯
১৫মে ১৯৪২

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো
কলকাতা - ৯

মুদ্রক :
চয়ণিকা প্রেস প্রাঃ লিমিটেড
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৯

লেজার সেটিং :
ই-মেজ
৩৬/১ ফিডার রোড, জলকল
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী
শ্রী প্রণবেশ মাইতি

রাজকুমারের মতো অসংখ্য ছেলে দেখেছি। তারা নানারকম, কিন্তু আসলে এক। রাজকুমারকে 'টাইপ' বলে ধরলে ভুল করা হবে। একজনের মধ্যে অনেককে রূপ দেবার চেষ্টা করছি। এই 'অনেক' যারা, তাদের মধ্যে মূলগত মিল আছে, তাই এটা সম্ভব হল। রাজকুমার একটু বেলুনের মতো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু তাতে কিছু আসবে যাবে কি? আমার উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

বেলা তিনটার সময় রাজকুমার টের পাইল, তার মাথা ধরিয়াছে। এটা নতুন অভিজ্ঞতা নয়, মাঝে মাঝে তার মাথা ধরে। কেন ধরে সে নিজেও জানে না, তার ডাক্তার বন্ধু অজিতও জানে না। তার চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, ব্লাডপ্রেশার ঠিক আছে, হজমশক্তি ঠিক আছে,—শরীরের সমস্ত কলকব্‌জাগুলিই মোটামুটি এতখানি ঠিক আছে যে মাঝে মাঝে মাথাধরার জন্য তাদের কোনোটিকেই দায়ি করা যায় না। তবু মাঝে মাঝে মাথা ধরে।

অজিত অবশ্য এক জোড়া কারণের কথা বলিয়াছে : আলসেমি আর স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতিতে অবহেলা। রাজকুমার তার এই ভাসা ভাসা আবিষ্কারে বিশ্বাস করে না। প্রথম কারণটা একেবারেই অর্থহীন, সে অলস নয়, তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। দ্বিতীয় কারণটা যুক্তিতে টেঁকে না, স্বাস্থ্যরক্ষার রীতিনীতি না মানিলে স্বাস্থ্য খারাপ হইতে পারে, মাথা ধরিবে কেন?

অজিত খোঁচা দিয়া বলিয়াছে : তোর স্বাস্থ্য খুব ভালো, না?

অসুখে তো ভুগি না।

মাথা ধরাটা—

মাথা ধরা অসুখ নয়।

মাথা খারাপ হওয়াটা?

আজ গোড়াতেই মাঝে মাঝে সাধারণ মাথাধরার সঙ্গে আজকের মাথাধরার তফাতটা রাজকুমার টের পাইয়া গেল। দুচার মাস অন্তর তার এ রকম খাপছাড়া মাথাধরার আবির্ভাব ঘটে। নদীতে জোয়ার আসার মতো মাথায় একটা ভোঁতা দুর্বোধ্য যন্ত্রণার সঞ্চার সে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, তারপর বাড়িতে বাড়িতে পরিপূর্ণ জোয়ারের মতো যন্ত্রণাটা মাথার মধ্যে থমথম করিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। মাথাধরা কমানোর ওষুধে শুধু যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ে, ঘুমের ওষুধে যন্ত্রণাটা যেন আরও বেশি ভোঁতা আর ভারী হইয়া দম আটকাইয়া দিতে চায়।

খাটের বিছানায় তিনটি মাথার বালিশের উপর একটি পাশবালিশ চাপাইয়া আধশোয়া অবস্থায় রাজকুমার বসিয়া ছিল। তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। মাথা ধরিলে রাজকুমারের এ রকম হয়। সাধারণ জল, ডাবের জল, শরবৎ কিছুতেই তার তৃষ্ণা মেটে না। এটাও তার জীবনের একটা দুর্বোধ্য রহস্য। শুকনো মুখের অপ্রাপ্য রস গিলিবার চেষ্টার সঙ্গে চাষার গোরু তাড়ানোর মতো একটা আওয়াজ করিয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

চারকোনা মাঝারি আকারের ঘর, আসবাব ও জিনিসপত্রে ঠাসা এই ঘরখানাই

রাজকুমারের শোয়ার ঘর, বসিবার ঘর, লাইব্রেরি, গুদাম এবং আরও অনেক কিছু। অনেক কালের পুরানো খাটখানাই এক চতুর্থাংশ স্থান—আরও একটু নিখুঁত হিসাব ধরিলে $\frac{৪৫৭}{১৭৭৬}$ স্থান রাজকুমার একদিন খেয়ালের বশে মাপিয়া দেখিয়াছে,—দখল করিয়া আছে। বই বোঝাই তিনটি আলমারি ও একটি টেবিল, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ওষুধের শিশি, কাচের গ্লাস, চায়ের কাপ, জুতা পালিশের কৌটা, চশমার খাপ প্রভৃতি অসংখ্য খুঁটিনাটি জিনিসে বোঝাই আরেকটি টেবিল, তিনটি চেয়ার, একটি ট্রাঙ্ক এবং দুটি বড়ো ও একটি ছোটো চামড়ার সুটকেস, ছোটো একটা আলনা, এ সমস্ত কেবল পা ফেলিবার স্থান রাখিয়া বাকি মেঝেটা আত্মসাৎ করিয়াছে।

তবে রাজকুমার কোনোরকম অসুবিধা বোধ করে না। এ ঘরে থাকিতে তার বরং রীতিমতো আরাম বোধ হয়। ঘরখানা যেমন জিনিসপত্রে বোঝাই, তেমনি অনেক দিনের অভ্যাস ও ঘনিষ্ঠতার স্বস্তিতেও ঠাসা।

এই ঘরে মাথাধরার যন্ত্রণা সহ্য করিবার মধ্যেও যেন মৃদু একটু শান্তি আর সান্ত্বনার আমেজ আছে। জগতের কোটি কোটি ঘরের মধ্যে এই চারকোনা ঘরটিতেই কেবল নির্বিকার অবহেলার সঙ্গে গা এলাইয়া দিয়া সে মাথার যন্ত্রণায় কাবু হইতে পারে।

মাথাধরা বাড়িবার আগে এবং স্থায়ীভাবে গা এলানোর আগে কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়া ফেলা দরকার। মনে মনে রাজকুমার ব্যবস্থাগুলির হিসাব করিতে লাগিল। রসিকবাবুর বাড়ি গিয়া গিরীন্দ্রনন্দিনীর মাকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ রাত্রে তাদের বাড়ি খাওয়া অসম্ভব। অবনীবাবুর বাড়ি গিয়া মালতীকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ সে তাকে পড়াইতে যাইতে পারিবে না। স্যার কে,এল-এর বাড়ি গিয়া রিণিকে বলিয়া আসিতে হইবে, আজ তার সঙ্গে কারও পার্টিতে যাওয়া বা জলতরঙ্গ বাজনা শোনানোর ক্ষমতা তার নাই। কেদারবাবুর বাড়ি গিয়া সরসীকে বলিয়া আসিতে হইবে, সমিতির সভায় গিয়া আজ সে বক্তৃতা দিলে, সকলে শুধু উঃ আঃ শব্দই শুনিতে পাইবে। রাজেনকে একটা ফোন করিয়া দিতে হইবে, কাল সকালে কাজে ফাঁকি না দিয়া তার উপায় নাই।

এই কাজগুলি শেষ করিতে বেশিক্ষণ সময় লাগিবে না, গিরি, মালতী, রিণি আর সরসী চার জনের বাড়িই তার বাড়ির খুব কাছে, এক-রকম পাশের বাড়িই বলা যায়। পশ্চিমে বড়ো রাস্তার ধারে স্যর-কে এল-এর প্রকাণ্ড বাড়ির পিছনে তার বাড়িটা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে, স্যর কে এল-এর বাড়ির পাশের গলি দিয়া ঢুকিয়া তার বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছতে হয়। উত্তরে গলির মধ্যে তার বাড়ির অপরদিকে কেদারবাবুর বাড়ি। পুবে গলির মধ্যে আর একটু আগাইয়া গেলে ডানদিকে যে আরও ছোটো গলিটা আছে তার মধ্যে ঢুকিলেই বাঁ দিকে অবনীবাবুর বাড়ি। দক্ষিণে ছোটো গলিটা ধরিয়া খানিক আগাইয়া ডানদিকে হঠাৎ মোড় ঘুরিবার পর রসিকবাবুর বাড়ি এবং গলিটারও সেইখানেই সমাপ্তি। রিণি আর সরসী দুজনের বাড়িতেই ফোন আছে, রাজেনকে ফোন করিতেও হাঙ্গামা হইবে না।

কতকটা পাঞ্জাবি এবং কতকটা শার্টের মতো দেখিতে তার নিজস্ব ডিজাইনের জামাটি গায়ে দিয়া রাজকুমার ঘরের বাহিরে আসিল।

বাড়ির দোতলার অর্ধেকটা দখল করিয়া আছে স্বামী-পুত্র এবং স্বামীর দুটি ভাইবোন সহ মনোরমা নামে রাজকুমারের এক দূর সম্পর্কের দিদি। প্রথমে তারা ভাড়াটে হিসাবেই আসিয়াছিল এবং প্রথম মাসের বাড়ি ভাড়াও দিয়াছিল ভাড়াটে হিসাবেই। কিন্তু সেই এক মাসের মধ্যে প্রায়-সম্পর্কহীন ভাইবোনের সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়ানোয় মনোরমা একদিন বলিয়াছিল, দ্যাখো ভাই রাজু, তোমার হাতে ভাড়ার টাকা তুলে দিতে কেমন যেন লজ্জা করে।

শুনিয়া রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সেরেছে! এই জন্য সম্পর্ক আছে এমন মানুষকে ভাড়াটে নিতে অজিত বারণ করেছিল!

মনোরমা আবার বলিয়াছিল, ভাড়া দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক তো তোমার সঙ্গে আমাদের নয়।

রাজকুমার কথা বলে নাই। বলিতে পারে নাই।

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না? একলা মানুষ তুমি ঠাকুর চাকর রেখে হাঙ্গামা পোয়াবার তোমার দরকার? আমি থাকতে ঠাকুরের রান্নাই বা তোমাকে খেতে হবে কেন?

গজেন মন্দ রাঁধে না।

আহা, কী রান্নাই রাঁধে! কদিন খেয়েছি তো এটা ওটা চেয়ে নিয়ে। জিভের স্বাদ তোমার নষ্ট হয়ে গেছে রাজুভাই, দুদিন আমার রান্না খেয়ে ওর ডাল তরকারি মুখে দিতে পারবে না।

প্রস্তাবটা প্রথমে রাজকুমারের ভালো লাগে নাই। একা নিজের জন্য ঠাকুর চাকর রাখিয়া সংসার চালানোর যত হাঙ্গামাই থাক, যেভাবে খুশি সংসার চালানো এবং যা খুশি করা, যখন খুশি আর যা খুশি খাওয়ার সুখটা আছে। কিন্তু এখন মনোরমা আর অজানা অচেনা প্রায়-সম্পর্কহীনা আত্মীয় নয়, এক মাসে সে প্রায় আসল দিদিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তার এ ধরনের প্রস্তাবে না-ই বলা যায় কেমন করিয়া?

সেই হইতে মনোরমা ভাড়ার বদলে রাজকুমারকে চার বেলা খাইতে দেয়, তার ঘরখানা গুছানো ছাড়া দরকারি অন্য সব কাজও করিয়া দেয়। রাজকুমার তার ঘর গুছাইতে দিলে যে মনোরমা নিজেই হোক বা তার ননদকে দিয়াই হোক এ কাজটা করিয়া দিত, তাতেও কোনো সন্দেহ নাই।

রাজকুমার বাহিরে যাইতেছে টের পাইয়া মনোরমা ডাকিল, কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজুভাই, শুধু একটিবার?

দিনের মধ্যে রাজকুমারকে সে অন্তত আট দশবার ডাকে, কিন্তু প্রত্যেকবার তার ডাক শুনিয়া মনে হয়, এই তার প্রথম এবং শেষ আহ্বান, আর কখনও ডাক দিয়া সে

রাজকুমারকে বিরক্ত করিবে না। দক্ষিণের বড়ো লম্বাটে ঘরখানার মেঝেতে বসিয়া মনোরমা সেলাই করিতেছিল। এ ঘরে আসবাব খুব কম। খাট, ড্রেসিং টেবিল আর ছোটো একটি আলমারি ছাড়া আর যা আছে সে সবের জন্য বেশি জায়গা দিতে হয় নাই। পরিষ্কার লাল মেঝেতে গরমের সময় আরামে গড়াগড়ি দেওয়া চলে।

এত শিগগিরি যাচ্ছ কেন রাজুভাই?

সেখানে যাচ্ছি না।

কোথায় যাচ্ছ তবে?

একটা ফোন করে আসব।

ও, ফোন করবে। পাঁচটার সময় ওখানে যেও, তা হলেই হবে। কালী সেজেগুজে ঠিকঠাক হয়ে থাকবে, বলে দিয়েছি।

আজ যেতে পারব না দিদি।

মনোরমা হাসিমুখে বলিল, পারবে না? একটা কাজের ভার নিয়ে শেষকালে ফ্যাসাদ বাধানোর স্বভাব কি তোমার যাবে না, রাজুভাই? কালীকে আজ আনাব বলে রেখেছি, কত আশা করে আছে মেয়েটা, কে এখন ওকে আনতে যাবে?

আমার মাথা ধরেছে।

আবার মাথা ধরেছে? কতবার বললাম একটা মাদুলি নাও—না না, ওসব কথা আর আরম্ভ করো না রাজুভাই, ওসব আমি জানি, আমি মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে নই। মাদুলি নিলে মাথাধরা সেরে না যাক, উপকার হবে।

ছাই হবে।

কিছু উপকার হবেই। ভূতেও তো তোমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু রাত দুপুরে একা একা শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখো তো একবার, ভয় না করলেও দেখবে কেমন কেমন লাগবে। অবিশ্বাস করেও তুমি একটা মাদুলি নাও, আমার কথা শুনে নাও, মাথার যন্ত্রণা অন্তত একটু কম হবেই।

মনোরমা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল।

মাথা ধরুক আর যাই হোক, কালীকে তোমার আনতে যেতে হবেই রাজুভাই। না গেলে কোনোদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

বেশ বোঝা যায়, মনোরমা রাগ করে নাই, শুধু অভিমানে মুখভার করিয়াছে। স্নেহের অভিমান, দাবির অভিমান।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা দেখি। যেতে পারলে যাবখন।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর মা ঘরে ঘুমাইতেছিলেন। গিরি নিজেই দরজা খুলিয়া দিল। রোগা লম্বা পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে, তেরো বছরের বেশি বয়স মনে হয় না। রাজকুমারের

পরামর্শে রসিকবাবু মেয়েকে সম্প্রতি একটি পুষ্টিকর টনিক খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। টনিকের নামটা রাজকুমার অজিতের কাছে সংগ্রহ করিয়াছিল।

অজিত বলিয়াছিল, এমন টনিক আর হয় না রাজু। ভুল করে একবার একটা সাত বছরের মেয়েকে খেতে দিয়েছিলাম, তিন মাস পরে মেয়েটার বাবা পাগলের মতো তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করল।

গিরি মাসখানেক টনিকটা খাইতেছে কিন্তু এখনও কোনো ফল হয় নাই। তবু শেমিজ ছাড়া শুধু ডুরে শাড়িটি পরিয়া থাকার জন্য গিরি যেন সংকোচে একেবারে কাবু হইয়া গেল। যতই হোক, বাঙালি গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো, পনেরো ষোলো বছর বয়স তো তার হইয়াছে। ডুরে শাড়ি দিয়া ক্রমাগত আরও ভালোভাবে নিজেকে ঢাকিবার অনাবশ্যক ও খাপছাড়া চেষ্টার জন্য গিরির মতো অল্প অল্প বোকাটে ধরনের সহজ সরল হাসিখুশি ছেলেমানুষ মেয়েটাকে পর্যন্ত মনে হইতে লাগিল বয়স্কা পাকা মেয়েমানুষ।

ছোটো উঠান, অতিরিক্ত ঘষামাজায় ঝকঝকে, তবু যেন অপরিচ্ছন্ন। কলের নীচে ছড়ানো এঁটো বাসন, একগাদা ছাই, বাসন মাজা ন্যাতা, ক্ষয় পাওয়া ঝাঁটা, নালার ঝাঁঝরার কাছে পানের পিকের দাগ, সিঁড়ির নিচে কয়লা আর ঘুঁটের স্তূপ, শুধু এই কয়েকটি সংকেতই যেন সযত্নে সাফ করা উঠানটি নোংরা হইয়া যাইতেছে।

কোথা পালাচ্ছ? শুনে যাও?

একধাপ সিঁড়িতে উঠিয়া গিরি দাঁড়াইল এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার যা বলিতে আসিয়াছে শুনিল। তারপর কাতরভাবে অভিমানের ভঙ্গিতে খোঁচা দেওয়ার সুরে বলিল, তা খাবেন কেন গরিবের বাড়িতে।

আমার ভীষণ মাথা ধরেছে গিরি।

মাথা আমারও ধরে। আমি তো খাই!

তুমি এক নম্বরের পেটুক, খাবে বইকী।

আমি পেটুক না আপনি পেটুক? সেদিন অতগুনো ক্ষীরপুলি—গিরি খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ডুরে শাড়ি সংক্রান্ত কুৎসিত সংকেতের বিরক্তি সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের মন হইতে মিলাইয়া গেল রোদের তেজে কুয়াশার মতো। একটু গ্লানিও সে বোধ করিতে লাগিল। নিজের অতিরিক্ত পাকা মন নিয়া জগতের সরল সহজ মানুষগুলিকে বিচার করিতে গিয়া হয়তো আরও কতবার সে অমনি অবিচার করিয়াছে। নিজের মনের আলোতে পরের সমালোচনা সত্যই ভালো নয়।

কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করিয়া সে বলিল, সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব কিনা, তাই খেতে আসতে পারব না।

খেয়ে গিয়ে বুঝি শুয়ে থাকা যায় না?

খেলে মাথার যন্ত্রণা বাড়ে। আজ উপোস দেব ভাবছি।

গিরি গম্ভীর হইয়া বলিল, না খেলে মাথাধরা আরও বাড়বে। শরীরে রক্ত কম থাকলে মাথা ধরে। খাদ্য থেকে রক্ত হয়।

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, তোমার সেই ডাক্তার বলেছে বুঝি, যে তোমার নাড়ি খুঁজে পায়নি?

কয়েক মাস আগে গিরির জ্বর হইয়াছিল দেখিতে আসিয়া ডাক্তার নাকি তার কব্জি হাতড়াইয়া নাড়ি খুঁজিয়া পান নাই। হয়তো নাড়ি খুব ক্ষীণ দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, গিরির পাল্স নাই। সেই হইতে গিরি সগর্বে সকলের কাছে গল্প করিয়া বেড়ায়, সে এমন আশ্চর্য মেয়ে যে তার পাল্স পর্যন্ত নাই। সকলের যা আছে তার যে তা নাই, এতেই গিরির কত আনন্দ, কত উত্তেজনা। রাজকুমারের কাছেই সে যে কতবার এ গল্প বলিয়াছে তার হিসাব হয় না। রাজকুমার অনেকবার তাকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কীভাবে মানুষের হার্টের কাজ চলে, কী ভাবে শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল করে—অনেক কিছু বুঝাইয়া বলিয়াছে। বোকা মেয়েটাকে নানাকথা বুঝাইয়া বলিতে তার বড়ো ভালো লাগে। কিন্তু গিরি বুঝিয়াও কিছু বুঝিতে চায় না।

সত্যি আমার নাড়ি নেই। আপনার বুঝি বিশ্বাস হয় না?

বাঁচিয়া থাকার সঙ্গে নাড়ির স্পন্দন বজায় থাকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাটা রাজকুমার অনেকবার গিরিকে বুঝাইয়া বলিয়াছে, কোনোদিন তার হাত ধরিয়া নাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে নাই। আজ সোজাসুজি গিরির ডান হাতটি ধরিয়া বলিল, দেখি, কেমন তোমার নাড়ি নেই।

গিরি বিব্রত হইয়া বলিল, না না, আজ নয়। এখন নয়।

রাজকুমার হাসিমুখে বলিল, এই তো দিব্বি টিপ্‌টিপ্ করছে পালস্।

গিরি আবার বলিল, থাক না এখন, আরেকদিন দেখবেন।

গিরির মুখের ভাব লক্ষ করিলে রাজকুমার নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছাড়িয়া দিয়া তফাতে সরিয়া যাইত এবং নিজের পাকা মনের আলোতে জগতের সহজ সরল মানুষগুলিকে বিচার করিবার জন্য একটু আগে অনুতাপ বোধ করার জন্য নিজেকে ভাবিত ভাবপ্রবণ। কিন্তু গিরির সঙ্গে তামাশা আরম্ভ করিয়া অন্যদিকে তার মন ছিল না।

হাসির বদলে মুখে চিন্তার ছাপ আনিয়া সে বলিল, তোমার পালস্ তো বড়ো আস্তে চলছে গিরি। তোমার হার্ট নিশ্চয় খুব দুর্বল। দেখি—

ডুরে শাড়ির নীচে সেখানে গিরির দুর্বল হার্ট স্পন্দিত হইতেছিল, সেখানে হাত রাখিয়া রাজকুমার স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করিতে লাগিল। গিরির মুখের বাদামি রং প্রথমে হইয়া গেল পাঁশুটে, তারপর হইয়া গেল কালোটে। একে আজ গায়ে তার শেমিজ নাই, তারপর চারিদিকে নাই মানুষ। কী সর্বনাশ!

ছি ছি! এসব কী!

রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিল, কী হয়েছে?

গিরি দমক মারিয়া তার দিকে পিছন ফিরিয়া, একবার হোঁচট খাওয়ার উপক্রম করিয়া তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। রাজকুমার হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। একী ব্যাপার?

ব্যাপার বুঝা গেল কয়েক মিনিট পরে উপরে গিয়া। গিরির মা পাটিতে পা ছড়াইয়া হাতে ভর দিয়া বসিয়ে আছেন। দেখিলেই বুঝা যায়, সবে তিনি শয়নের আরাম ছাড়িয়া গা তুলিয়াছেন,— বসিবার ভঙ্গিতেও বুঝা যায়, মুখের ভঙ্গিতেও বুঝা যায়। মানুষটা একটু মোটা, গা তোলার পরিশ্রমেই বোধ হয় একটু হাঁপও ধরিয়া গিয়াছে।

রাজকুমার বলিতে গেল, গিরি—

গিরির মা বাধা দিয়া বলিলেন, লজ্জা করে না? বেহায়া নচ্ছার কোথাকার!

এমন সহজ সরল ভাষাও যেন রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

গিরির মা আবার বলিলেন, বেরো হারামজাদা, বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গিরির মার রাগটা ক্রমেই চড়িতেছিল। আরও যে কয়েকটা শব্দ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল সেগুলি সত্যই অশ্রাব্য।

রাজকুমার ধীরে ধীরে রসিকবাবুর বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, ক্ষুব্ধ আহত ও উদ্‌ভ্রান্ত রাজকুমার। ব্যাপারটা বুঝিয়াও সে যেন ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ যেন একটা যুক্তিহীন ভূমিকাহীন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দামি জামাকাপড় পরিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়াছিল, হঠাৎ কী ভাবে যেন পচা পাঁক ভরা নর্দমায় পড়িয়া গিয়াছে। এই রকম একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার পর্যায়ে না ফেলিয়া এ ব্যাপারটা যে সত্যসত্যই ঘটিয়া গিয়াছে এ কথা কল্পনা করাও তার অসম্ভব মনে হইতেছিল।

নিছক দুর্ঘটনা,—কারও কোনো দোষ নাই, দোষ থাকা সম্ভব নয়। ভুল বুঝিবার মধ্যেও তো যুক্তি থাকে মানুষের, ভুল বুঝিবার সপক্ষে ভুল যুক্তির সমর্থন? গায়ে কেউ ফুল ছুঁড়িয়া মারিলে মনে হইতে পারে ফাজলামি করিয়াছে, সহানুভূতির হাসি দেখিয়া মনে হইতে পারে ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু ফুল আর হাসির আঘাতে হত্যা করিতে চাহিয়াছে এ কথা কি কোনোদিন কারও মনে হওয়া সম্ভব? কতটুকু মেয়েটা। বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করিবার সময় বুকটা তার বালকের বুকের মতো সমতল মনে হইয়াছিল। যে মেয়ের দেহটা পুরুষের উপভোগের উপযুক্ত হইতে আজও পাঁচ সাতবছর বাকি আছে সেই মেয়ের মনে তার সহজ সরল ব্যবহারটির এমন ভয়াবহ অর্থ কেমন করিয়া জাগিল?

মাথাধরার কথাটা কিছুক্ষণের জন্য রাজকুমার ভুলিয়া গিয়াছিল, বাকি যে কয়েকটি কর্তব্য পালন করিবে ঠিক করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল, সেগুলির কথাও মনে ছিল

না। নিজের বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছিয়া মাথাধরা আর দরকারি কাজের কথা একসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু ফিরিতে আর সে পারিল না, নিজের ঘরখানার জন্য তার মন তখন ছটফট করিতেছে। জিনিসপত্রে ঠাসা ওই চারকোনা ঘরে যেন তার মাথাধরার চেয়ে কড়া যে বর্তমান মানসিক যন্ত্রণা তার ভালো ওষুধ আছে।

কে যায়? রাজু? একবারটি শুনে যাবে রাজুভাই, এক মিনিটের জন্যে?

এবার দেখা গেল, মনোরমা তার দেড় বছরের ছেলেকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। কচি কচি হাত দিয়া খোকা তার আঁচলে ঢাকা পরিপুষ্ট স্তন দুটিকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। রাজকুমারের দৃষ্টি দেখিয়া মনোরমা মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, এমন দুষ্ট হয়েছে ছেলেটা! খায় না কিন্তু ঘুমানোর আগে ধরা চাই। মনে মনে খাওয়ার লোভটা এখনও আছে আর কি।

তুমিই ওর স্বভাবটা নষ্ট করছ দিদি। ধরতে দাও কেন? মনোরমা আবার মৃদু হাসিল।

দ্যাখো না ছাড়াবার চেষ্টা করে?

সরল সহজ আহ্বান, একান্ত নির্বিকার। পঞ্চাশ বছরের একজন স্ত্রীলোক যেন তার কাঁচা পাকা চুলে ভরা মাথা হইতে দুটি পাকা চুল তুলিয়া দিতে বলিতেছে দশ বারো বছরের এক বালককে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর বাড়ি ঘুরিয়া আসিবার আগে হইলে হয়তো রাজকুমার কিছুমাত্র সংকোচ বা অস্বস্তি বোধ করিত না, এখন মনোরমার প্রস্তাবে সে যেন নিজের মধ্যে কুঁচকাইয়া গেল।

মনোরমা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, খোকাকে ছোঁয়ার নামেই ভড়কে গেলে! ছোটো ছেলেপিলেকে ছুঁতেই তোমার এত ঘেন্না কেন বলো তো রাজুভাই?

রাজকুমার বিব্রত হইয়া বলিল, না না, ঘেন্না কে বললে, ঘেন্না কীসের!

তারপর অবশ্য মনোরমার স্তন হইতে খোকার হাত দুটি ছাড়াইয়া দিবার চেষ্টা তাকে করিতে হইল। মনোরমা স্নেহের আবেশে মুগ্ধ চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল তার আধো ঘুমন্ত খোকার নির্বিকার প্রশান্ত মুখে কান্না-ভরা প্রচণ্ড প্রতিবাদের দ্রুত আয়োজন আর জগতের অষ্টামাশ্চর্য দেখিবার মতো বিস্ময়ভরা চোখ মেলিয়া রাজকুমার দেখিতে লাগিল মনোরমার মুখ। খোকার কচি হাত আর মনোরমার কোমল স্তনের স্পর্শ যেন অবিস্মরণীয় সুগন্ধি অনুভূতিতে ভরা তেজস্কর রসায়নের মতো তার মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিল। তার আহত মনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গেল।

খোকার হাত বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না, তীক্ষ্ণগলার প্রচণ্ড আর্তনাদে কানে তালা ধরাইয়া সে তখন প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়িবার জন্য ছটফট করিতেছে।

মনোরমা বলিল, দেখলে?

রাজকুমার মেঝেতে বসিয়া বলিল, হুঁ, ছোঁড়ার সত্যি তেজ আছে!

মনোরমার হাসিভরা মুখখানা মুহূর্তে অন্ধকার হইয়া গেল। ভুরু বাঁকাইয়া

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলিল, ছোঁড়া মানে? ছোঁড়া বলছ কাকে শুনি?

রাজকুমার থতমত খাইয়া গেল।—আহা এমনি বলেছি, আদর করে বলেছি—

মনোরমার রাগ ঠাণ্ডা হইল না।—বেশ আদর তো তোমার! আমার ছেলেকে যদি আদর করে ছোঁড়া বলতে পারো, আমাকেও তো তবে তুমি আদর করে বেশ্যা বলতে পারো অনায়াসে। এ আবার কোন দেশি আদর করা, এমন কুচ্ছিত গাল দিয়ে!

ছোঁড়া কথাটা তো গাল নয় দিদি।

নয়? ছোঁড়া কাদের বলে শুনি? যারা নেংটি পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, পকেট মারে, মদ-গাঁজা ভাং খায়, মেয়েদের দেখলে শিস দেয়, বিচ্ছিরি সব ব্যারামে ভোগে—আমি জানি না ভেবেছ!

অনেক প্রতিবাদেও কোনো ফল হইল না। আহতা অভিমানিনী মনোরমার মুখের মেঘ স্থায়ী হইয়া রহিল। নিজেই অবশ্য সে কথাটা চাপা দিয়া দিল, বলিল যে যাকগে, থাক, ও কথা বলে আর হবে কি, আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কথাই রইল রাজুভাই, তুমি কিছু ভেবে কথাটা বলোনি,—কিন্তু বেশ বুঝা যাইতে লাগিল, মনে মনে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

ফোন করেছ?

না, এইবার যাব।

ফোন করতেই না গেলে?

না, গিরিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ফোন করার কথাটা মনে ছিল না।

খেয়াল খুশির বাধা অপসারিত হওয়ার একটু পরেই খোকা আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গম্ভীর মুখে অকারণে খোকার মুখে একটা চুমা খাইয়া মনোরমা বলিল, গিরিদের বাড়ি কেন?

গিরির মা রাত্রে খেতে বলেছিল, তাই বলতে গিয়েছিলাম আজ আর খেতে যেতে পারব না।

কে কে ছিল বাড়িতে? গিরি কী করছিল?

গিরি মার কাছে শুয়েছিল। ওরা দুজনেই বাড়িতে ছিল, এ সময় আর কে বাড়ি থাকবে?

দরজা খুলল কে?

এ রীতিমতো জেরা। মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য যেন একটু কমিয়াছে, গলার সুরে বেশ আগ্রহ টের পাওয়া যায়।

রাজকুমারের একবার ক্ষণেকের জন্য মনে হইল, মনোরমাকে সব কথা খুলিয়া বলে। গিরি আর গিরির মা তাদের অসভ্য গেঁয়ো মনোবৃত্তি নিয়া অকারণে বিনা দোষে তাকে আজ কী অপমানটা করিয়াছে আর মনে কত কষ্ট দিয়াছে সবিস্তারে জানাইয়া

মনোরমার সহানুভূতি আদায় করিয়া একটু সুখ ভোগ করে। খোকাকে ছোঁড়া বলার জন্য মনোরমা এমন খাপছাড়া ভাবে ফোঁস করিয়া না উঠিলে সে হয়তো বিনা দ্বিধাতেই ব্যাপারটা তাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়া দিত। এখন ভরসা পাইল না, খোকাকে উপলক্ষ করিয়া অসাধারণ ধীরতা, স্থিরতা, সরলতা আর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়া মনোরমা তার মনে যে অগাধ শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছিল, কয়েক মিনিট পরে খোকাকে উপলক্ষ করিয়াই মনোরমা নিজেই আবার সে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সব কথার ঠিক মানেই যে মনোরমা বুঝিবে সে ভরসা রাজকুমারের আর নাই। কে জানে নিজের মনে ব্যাপারটার কী ব্যাখ্যা করিয়া সে কী ভাবিয়া বসিবে তার সম্বন্ধে!

তাই সে বিরক্ত হওয়ার ভান করিয়া জবাব দিল, গিরি দরজা খুলল, কে আবার খুলবে?

মনোরমা কতক্ষণ কী যেন ভাবিল। মুখের গাম্ভীর্য ক্রমেই তার কমিয়া যাইতেছিল।

একটা কথা তোমায় বলি ভাই, রাগ কোরো না কিন্তু। তোমার ভালোর জন্যই বলা। আমি কিছু ভেবে বলছি না কথাটা, শুধু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। জেনে শুনে যদি দরকার মতো তোমায় সাবধান করেই না দিলাম, আমি তবে তোমার কীসের দিদি? অত বেশি যখন তখন গিরিদের বাড়ি আর যেও না।

কেন?

আহা, কেমন ধারা মানুষ ওরা তা তো জানো? গেঁয়ো অসভ্য মানুষ ওরা, কুলিমজুরদের মতো ছোটো মন ওদের, সব কথার বিচ্ছিরি দিকটা আগে ওদের মনে আসে। বড়ো হলে ভাইবোন যদি নির্জনে বসে গল্প করে, তাতেও ওরা ভয় পেয়ে যায়। বড়ো সড়ো একটা মেয়ে যখন বাড়িতে আছে, কী দরকার তোমার যখন তখন ওদের বাড়ি যাবার? বিপদে পড়ে যাবে একদিন।

ওইটুকু একটা মেয়ে—

মনোরমা বাধা দিয়া বলিল, ওইটুকু মেয়ে মানে? আজ মেয়ের বিয়ে দিলে ওর মা একবছর পরে নাতির মুখ দেখবার আশায় থাকবে। ওরা তো আর তোমাদের মতো মানুষ নয় রাজুভাই যে ওইটুকু দেখায় বলেই ভাববে আজও মেয়ের ফ্রক পরে থাকার বয়েস আছে! যেমন ধরো ও বাড়ির রিণি, গিরির চেয়ে বয়সেও বড়ো এমনিও বড়ো দেখায় ওকে। সেদিন রিণিকে একা নিয়ে তুমি বায়স্কোপ দেখাতে গেলে, একদিন গিরিকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেখো তো ওর বাপ মা কী বলে?

মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য একেবারেই উপিয়া গিয়াছে, তার সুন্দর মুখখানিতে থমথম করিতেছে কথা বলার আবেগ।

তারপর ধরো সরসী। ওর বাড়ন্ত গড়ন দেখলে আমারই ভয় করে, সে দিন তুমি ওর হাত ধরে টানছিল—

তামাশা করছিলাম।

তামাশাই তো করছিলে। কিন্তু একদিন তামাশা করতে গিয়ে ওমনি ভাবে গিরির হাত ধরে টেনো দিকি কী কাণ্ড হয়। সরসীর বাপ হাসছিল, গিরির বাপ-মা তোমায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। তুমি তো আর সামলে সুমলে চলতে জান না নিজেকে, তাই বলছিলাম, নাই বা বেশি মেলামেশা করলে ওদের সঙ্গে?

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া নিজেও মনোরমা কাত হইয়া তার পাশে শুইয়া পড়িল।

কালীকে আনতে যাবে না রাজুভাই?

যাব।

ঘরে গিয়া রাজকুমার বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাথাধরার কথাটা আবার সে ভুলিয়া গিয়াছে। শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, তবে কি গিরি আর গিরির মার কোনো দোষ ছিল না, সে-ই বোকার মতো একটা অসঙ্গত কাজ করিয়া তার স্বাভাবিক ফল ভোগ করিয়াছে? মনোরমা পর্যন্ত জানে যে গিরির হাত ধরিয়া টানার অপরাধে তাকে জ্যান্ত পুড়াইয়া মারাটাই গিরির বাপ-মার পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। তাই যদি হয়, এমনই সব রীতিনীতি চালচলনের মধ্যে এমনই সব মনের সাহচর্যে গিরি যদি বড়ো হইয়া থাকে আর দশটি মেয়ের মতো, তবে তো সে খাপছাড়া কিছুই করে নাই, ও অবস্থায় তার মতো আর দশটি মেয়ে যা করিত সেও তাই করিয়াছে। এবং মনোরমার কথা শুনিয়া তো মনে হয় ও রকম আর দশটি মেয়ের অভাব দেশে নাই।

বুঝিয়া চলিতে না পারিয়া সেই কি তবে অন্যায় করিয়াছে? কিন্তু রাজকুমারের মন সায় দিতে চায় না। ব্যাপারটা যদি সংসারের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত খাপছাড়া একটা দুর্ঘটনা নাও হয়, অসাধারণ কোনো কারণে ভুল করার বদলে আর দশটি মেয়ের মতো নিজের রুচিমাফিক সঙ্গত কাজই গিরি করিয়া থাকে, গিরির মার গালাগালিটাও যদি সংসারের সাধারণ চলতি ব্যাপারের পর্যায়ে গিয়া পড়ে তবে তো সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া দাঁড়ায় আরও ভয়ানক, আরও কদর্য! এমন বীভৎস মনের অবস্থা কেন হইবে মানুষের? এমন পারিপার্শ্বিকতাকে কেন মানুষ মানিয়া লইবে যার প্রভাবে মানুষের মন এতখানি বিকারগ্রস্ত আর কুৎসিত হইয়া যায়?

মাথাটা আবার ভার মনে হইতে লাগিল। সত্যই কী আজ তার মাথা ধরিবে, না, অনেক চিন্তা আর উত্তেজনার ফলে আজ মাথাটা এরকম করিতেছে? একবার স্যার কে এল-এর বাড়ি গেলে হয় না, সে যে আজ তার পার্টিতে যাইতে পারিবে না এই কথাটা রিণিকে বলিয়া আসিতে? এবং একবার রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আসিতে?

রাজকুমারের মনে হইতে লাগিল, একবার রিণিদের বাড়ি গিয়া খেলার ছলে রিণির হাত ধরিয়া টানিয়া আর ব্লাউসের একটা বোতাম পরীক্ষা করিয়া সে যদি আজ প্রমাণ না করে যে ভদ্রমানুষ সব সময় সব কাজের কদর্য মানে করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে না, তবে তার মাথাটা ধীরে ধীরে বোমায় পরিণত হইয়া ফাটিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

রিণি চমৎকার গান গাহিতে পারে। অন্তত লোকে তাই বলে। গলাটি তার মৃদু ও মিহি, সুরগুলি তার কোমল ও করুণ, গান সে শিখিয়াছে নামকরা এক ওস্তাদের কাছে। ওস্তাদের বুদ্ধি ছিল তাই তিনি শিষ্যাকে কিছুমাত্র ওস্তাদি শিখাইবার চেষ্টা করেন নাই, শুধু শিখাইয়াছেন মোলায়েম সুর। কেউ কেউ অবশ্য বলে যে রিণি গান করে না, বিড়ালছানার ছাড়া ছাড়া করুণ আওয়াজটাকেই একটানা উচ্চারণ করিয়া যায়, তবু অনেকের কাছেই রিণির গান ভালো লাগে। মনটা উদাস হইয়া যায় অনেকের, ঘুমের বাহন ছাড়াই স্বগত স্বপ্ন নামিয়া আসে অনেকের চোখে, লজ্জা ও বেদনার সঙ্গে অনেকের মনে হয় যে এত ঘষা-মাজার পরেও তো তারা মার্জিত জীবনযাত্রার পথে বিনা চেষ্টায় পিছলাইয়া চলিবার মতো মোলায়েম হইতে পারে নাই।

স্যার কে এল-এর বাড়ির সদরের সুশ্রী দরজাটি পার হইয়া ভিতরে পা দেওয়া মাত্র টের পাওয়া যায়, বাহিরের রাস্তাটা কী নোংরা। কতবার রাজকুমার এ দরজা পার হইয়াছে কিন্তু একবারও দরজাটি পার হওয়ার এক মুহূর্ত আগে এই অভিজ্ঞতা তার মনে পড়ে না। স্যার কে এল-এর বাড়ির ভিতরটা শুধু দামি ও সুশ্রী আসবাবে সুন্দরভাবে সাজানো নয়, সদর দরজার এ পাশে এ বাড়ির বিস্ময়কর রূপ ও শ্রীর মহিমাটাই শুধু স্পষ্ট হইয়া নাই, কী যেন একটা ম্যাজিক ছড়ানো আছে চারিদিকে,—পার্থক্য ও দূরত্বের ইঙ্গিতভরা এক অহংকারী আবেষ্টনীর দুর্বোধ্য প্রভাবের ম্যাজিক।

বাড়িতে ঢুকিলেই রাজকুমার একটু ঝিমাইয়া যায়। একটা অদ্ভুত কথা তার মনে হয়। মনে হয় অনেকদিন আগে একবার এক পাহাড়ে একজন সংসারত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর গুহায় ঢুকিয়া তার যেমন গা ছমছম করিয়াছিল, এখানেও ঠিক তেমনই লাগিতেছে। আরাম উপভোগের আধুনিকতম কত আয়োজন এখানে, তবু তার মনে হয় এ বাড়িতে যারা বাস করে তারা যেন ধূলামাটির বাস্তব জগৎকে ত্যাগ করিয়াছে, রক্তমাংসের মানুষের হাসিকান্নায় ভরা সাধারণ স্বাভাবিক জীবনকে এড়াইয়া চলিতেছে।

উপরে গিয়া রাজকুমার টের পাইল, রিণি বড়ো হলঘরে গান গাহিতেছে। আজ পার্টিতে যে গানটি গাহিবে খুব সম্ভব সেই গানই প্র্যাকটিস করিতেছে। ঘরে গিয়া রাজকুমার রিণির কাছে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল। বড়ো কোমল গানের কথাগুলি, বড়ো মধুর গানের সুরটি। রাজকুমার হয়তো একটু মুগ্ধ হইয়া যাইত, কিন্তু সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে টের পাইয়াও রিণি টের না পাওয়ার ভান করিয়া আপন মনে গাহিয়া চলিতেছে বুঝিতে পারিয়া গানটা আর রাজকুমারের তেমন ভালো লাগিল না।

গান শেষ করিয়া রিণি মুখ তুলিল। রাজকুমারের উপস্থিতি টের পাইয়াও টের না পাওয়ার ভান করিয়া এতক্ষণ গান করুক, ভাবাবেশে কী অপরূপ দেখাইতেছে রিণির মুখ!

এ গানটা গাইলেই আমার এমন মন কেমন করে! মনে হয় আমি যেন একা, আমি যেন—

ধীরে ধীরে রাজকুমারের হাত ধরিয়া রিণি তাকে আরেকটু কাছে টানিয়া আনিল,

নিজের মুখখানা আরও উঁচু করিয়া ধরিল তার মুখের কাছে। গান গাহিয়া সে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রাজকুমারের কাছে আর কোনোদিন সে এ ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই।

প্রথমটা রাজকুমার বুঝিতে পারে নাই, তবে রিণির চোখ ও মুখের আহ্বান এত স্পষ্ট যে বুঝিতে বেশিক্ষণ সময় লাগা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। বুঝিতে পারিয়াই সে বিবর্ণ হইয়া গেল।

না, ছি।

ও!

রিণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু তফাতে সরিয়া গেল। চোখে আর আবেশের ছাপ নাই, মুখে উত্তেজনার রঙ নাই। চোখের পলকে সে যেন পাথরের মূর্তি হইয়া গিয়াছে।

কী চাই আপনার?

কিছু চাই না, এমনি তোমায় একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আমার বড়ো মাথা ধরেছে, আজ আর তাই তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে পারব না।

রিণি বলিল, তা নিজে অসভ্যতা করতে না এসে, একটা নোট পাঠিয়ে দিলেই পারতেন? যাকগে, মাথা যখন ধরেছে, কী করে আর যাবেন!

রাজকুমার মরিয়া হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করব ভেবেছিলাম রিণি!

রিণি যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।—আমার সঙ্গে গল্প। আচ্ছা বসুন।

গল্প তাই জমিল না। একজন যদি মুখ ভরা করিয়া বসিয়া থাকে আর থাকিয়া থাকিয়া সুকৌশলে অতি সূক্ষ্ম ও মার্জিত ভাবে খোঁচা দিয়া জানাইয়া দেয় যে অপরজন মানুষ হিসাবে অতি অভদ্র, গল্প আর চলিতে পারে কতক্ষণ?

কয়েক মিনিট পরেই রাজকুমার উঠিয়া গেল।

বিদায় নিয়া রাজকুমার তো ঘরের বাইরে চলিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে রিণি আবার আরম্ভ করিয়া দিল তার গানের প্র্যাকটিস। রাজকুমার তখন সবে সিঁড়ি দিয়া কয়েক ধাপ নামিয়াছে। রিণির গানের সেই অকথ্য করুণ সুর কানে পৌঁছানো মাত্র সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এত তাড়াতাড়ি রিণি নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সে তবে লজ্জা পায় নাই, অপমান বোধ করে নাই, বিশেষ বিচলিত হয় নাই? ব্যাপারটা রাজকুমারের বড়োই খাপছাড়া মনে হইতে লাগিল। সাগ্রহে মুখ বাড়াইয়া দিয়া চুম্বনের বদলে ধিক্কার শোনাটা এমন ভাবে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া তো মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

রেলিং ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রাজকুমার ভাবিতে থাকে। তার ব্যবহারকে রিণি অসভ্যতা বলিয়াছিল। লজ্জা পাওয়ার বদলে সমস্তক্ষণ রিণির কথায় ব্যবহারে ও চোখের দৃষ্টিতে একটা অবজ্ঞা মেশানো অনুকম্পার ভাবই স্পষ্ট হইয়া ছিল। তখন রাজকুমার ভাবিয়াছিল, ওসব প্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া। এখন তার মনে হইতে লাগিল, তার মনের

সংকীর্ণতার পরিচয় পাইয়া প্রথমে একটু রাগ এবং তারপর বিরক্তি ও অনুকম্পা বোধ করা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় রিণির মনে ঘটে নাই। শ্রীমতী গিরীন্দ্রনন্দিনী ও তার মাকে আজ যেমন তার বর্বর মনে হইয়াছিল, তার সম্বন্ধেও রিণির ঠিক সেই রকম একটা ধারণাই সম্ভবত জন্মিয়াছে।

এবং সে জন্যই রিণিকে দোষ দেওয়া চলে না। সত্যই সে রিণির সঙ্গে ছোটোলোকের মতো ব্যবহার করিয়াছে। কী আসিয়া যাইত রিণিকে চুম্বন করিলে? চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার চেয়ে এমন কী গুরুতর ব্যাপার নরনারীর আলগা চুম্বন? একটু প্রীতি বিনিময় করা, একটু আনন্দ জাগানো, মৈত্রীর যোগাযোগকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্পষ্টতরভাবে অনুভব করা। রিণি তাই চাহিয়াছিল। কিন্তু নিজে সে গিরীন্দ্রনন্দিনীর পর্যায়ের মানুষ কিনা, চুম্বনের জের চরম মিলন পর্যন্ত টানিয়া না চলাটাও যে যুবকযুবতির পক্ষে সম্ভব এ ধারণাও তার নাই কিনা, তাই সে ভাবিতেও পারে নাই রিণির আহ্বানে সাড়া দিলেও তাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কটা বজায় থাকিবে, অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়া যাইবে না।

চুম্বন অবশ্য নরনারীর মিলনেরই অঙ্গ। সুপবিত্র কোনো আধ্যাত্মিক মিথ্যার ধোঁয়া সৃষ্টি করিয়া রিণির সঙ্গে তার চুম্বন বিনিময়কে সে ব্যাখ্যা করিতে চায় না। কেন সে ভাবিতে পারে নাই চুম্বনের ভূমিকাতেই সমাপ্তি ঘটানোর মতো সংযম তাদের আছে? চোখ মেলিয়া রিণির রূপ সে দেখিয়া থাকে, কাছাকাছি বসিয়া হাসিগল্পের আনন্দ উপভোগ করে, মাঝে মাঝে স্পর্শ বিনিময়ও ঘটিয়া যায় কিন্তু আত্মহারা হইয়া পড়ার প্রশ্নও তো তাদের মনে জাগে না। সে কি কেবল এই জন্য যে ওই পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দশজনে অনুমোদন করে? চুম্বন বিনিময়ের অনুমতি দেওয়া থাকিলে তো আজ তার মনে হইত না রিণিকে চুম্বন করা বিবেকের গায়ে পিন ফুটানো এবং একবার পিন ফুটাইলে একেবারে ছোরা বসাইয়া বিবেককে জখম না করিয়া নিস্তার থাকিবে না!

কেবল সে একা নয়, সকলেই এই রকম। অনেক পরিবারে পনেরো বছরের মেয়েরও বাপ ভাই ছাড়া কোনো পুরুষের সামনে যাওয়া বারণ। এমন একটি মেয়ে যদি কেবল চুপিচুপি দুটি কথা বলার জন্যও পাশের বাড়ির ছেলেটাকে ডাকে, ছেলেটা কী ভাবিবে? রিণি চুম্বন চাওয়ার খানিক আগে সে যা ভাবিয়াছিল।

এমন একটা বিকৃত আবেষ্টনীর মধ্যে তারা মানুষ হইয়াছে যে অস্বাভাবিক মিথ্যা অসংযমকেই তারা স্বাভাবিক সত্য বলিয়া জানিতে শিখিয়াছে। মানুষ কেবল পরের নয়, নিজেরও সংযমে বিশ্বাস করে না। অসংযমের চেয়ে সংযম যে মানুষের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক, এ যেন কেউ কল্পনাও করিতে পারে না।

হঠাৎ রিণির গান বন্ধ হইয়া যাওয়ায় রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল যে, সিঁড়ির মাঝখানে সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে হলঘরের এক কোণে অবনীবাবুর মেয়ে মালতী বসিয়া ছিল। সামনে ছোটো টেবিলটিতে একটি বই ও খাতা। খুব সম্ভব কলেজ হইতে ফিরিবার সময় স্যার কে এল-এর বাড়িতে ঢুকিয়াছে। এখানে একা বসিয়া দুহাতের আটটি আঙুলে টেবিলের উপর টোকা দিয়া টুকটাক আওয়াজ তুলিবার কারণটা রাজকুমার ঠিক বুঝিতে পারিল না। আট আঙুলে টোকা দেওয়ার কারণ নয়, এখানে একা বসিয়া থাকিবার কারণ। মালতী বড়ো চঞ্চল। চাঞ্চল্যটা শুধু আঙুলে সীমাবদ্ধ রাখিয়া সে যে স্থির হইয়া বসিয়া আছে এটা সত্যই আশ্চর্যের ব্যাপার।

রাজকুমারকে দেখিবামাত্র টোকা দেওয়া থামিয়া গেল। চোখে মুখে তার যে দুষ্টামি ভরা চকিত হাসি খেলিয়া গেল, বনের হরিণী হাসিতে জানিলেও তার নকল করিতে পারিত না। সোজাসুজি তাকানোর বদলে মাথা একটু কাত করিয়া কোনাকুনি রাজকুমারের দিকে তাকাইয়া বলিল, এর মধ্যে তাড়িয়ে দিল?

তাড়িয়ে দিল মানে?

ও, তাড়িয়ে দেয়নি? আপনি নিজে থেকে চলে যাচ্ছেন? আমি ভাবলাম আপনাদের বুঝি ঝগড়া হয়েছে, আপনাকে তাড়িয়ে দিয়ে রিণি বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে।

কাঁদছে নাকি?

দিনরাত কাঁদে মেয়েটা, সময় অসময় নেই। আচ্ছা অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন বলুন তো? এ আবার কোন দেশি কান্না! আমি যদি কখনও কাঁদি, রিণির মতো আপনার জন্যেই কাঁদি, আমাকে আবার একটা অর্গান কিনতে হবে নাকি?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, রিণিকে জিজ্ঞেস করো অর্গান বাজিয়ে কাঁদে কেন। খুশি হয়ে তোমার একটা চোখ কানা করে দেবেখন।

পুরোপুরি গম্ভীর হওয়া মালতীর পক্ষে এক রকম অসম্ভব ব্যাপার, যতটা পারে গাম্ভীর্যের ভান করিয়া সে বলিল, জিজ্ঞেস করিনি ভাবছেন বুঝি? ও যে আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না, আমিও কখনও ওদের বাড়ি আসি না, সেটা তবে কী জন্যে?

ওদের বাড়ি আসো না মানে? এই তো এসেছ সশরীরে।

আজকের কথা বাদ দিন। আজ না এসে উপায় ছিল না। কলেজ থেকে ফিরছি, দেখি আপনি সরাসরি এ বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। ব্যাপারটা ভালো করে না জেনে আর কী তখন বাড়ি ফিরতে পারি, আপনিই বলুন?

রাজকুমার রাগ করিয়া বলিল, ব্যাপার আবার কীসের? শরীরটা ভালো নেই, আজ ওর পার্টিতে আসতে পারব না, তাই বলতে এসেছিলাম।

মালতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার মতো সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা ঠিক। শরীর খারাপ বলে যে পার্টিতে আসতে পারবে না, সে নিজেই খারাপ শরীর নিয়ে খবরটা দিতে আসে বটে। বাড়িতে যখন একটার বেশি চাকর নেই।

অন্য দরকারও ছিল।

আমিও তো তাই বলছি।

দরকার ছিল মানে—

মানে বুঝিয়ে বলতে হবে না স্যার! এ তো অঙ্ক নয় যে আপনি বুঝিয়ে না দিলে মাথায় ঢুকবে না। তার চেয়ে বরং—কাছে আসিয়া গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল,—সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অতক্ষণ কী ভাবছিলেন তাই বলুন। বলুন না, কাউকে বলব না আমি, আপনার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।

মালতী কখনও তাকে স্যার বলে না। রাজকুমার তাকে পড়ায় বটে রোজ, কিন্তু ঠিক গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক তাদের নয়। তার কথা বলার ভঙ্গি রাজকুমারকে আরও বেশি বিব্রত করিয়া তুলিল। রিণির সঙ্গে সত্যসত্যই কিছু না ঘটিয়া থাকিলে হয়তো সে রাগ করিতে পারিত, যদিও মালতীর উপর রাগ করা বড়ো কঠিন। মালতী তামাশা করে, সব সময়ে সব বিষয়ে এ রকম হালকা পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথা বলে, কিন্তু কখনও খোঁচায় না। পরিচিত সকলেই যেন তার কাছে নতুন জামাই আর সে তার মুখরা শ্যালিকা; মনে যদি কারও খোঁচা লাগে তার কথায়, সেটা তার মনের দোষ, মালতীর নয়।

হঠাৎ রাজকুমারের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।—কী দরকারে এসেছি, দেখবে? বলিয়া ঘরের একপাশে টেলিফোনের কাছে আগাইয়া গিয়া রিসিভারটা তুলিয়া নিল। কাল সে কাজে যাইতে পারিবে না রাজেনকে এই খবরটা দিয়া আরও কতগুলি আজেবাজে কথা বলিয়া রিসিভারটা নামাইয়া রাখিল।

দেখলে?

মালতী এতক্ষণ তার দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া রাখিয়াছিল, চার পাঁচবার মাথা হেলাইয়া সায় দিয়া বলিল, দেখলাম বইকী, নিশ্চয় দেখলাম। অমন কত দেখছি রোজ! শ্যামল করে কী জানেন, যখন তখন আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয় আর আমাকে ডেকে বলে,—একটা ফোন করব। অন্য সবাই রয়েছে বাড়িতে, তাছাড়া ফোন করার জন্য কারও অনুমতি চাওয়ারও ওর দরকার নেই, কিন্তু আমাকে ডেকে ওর বলা চাই। আমি বলি, বেশ তো, ফোন করুন। তারপর একথা সেকথা বলতে বলতে গল্প জমে যায়, বেচারির দরকারি ফোনটা আর করা হয় না।

কথার মাঝখানে রিণি ঘরে আসিয়াছিল। একবার বলিয়াছিল, মালতী নাকি?—কিন্তু মালতী তার দিকে চাহিয়াও দ্যাখে নাই। কথা শেষ হইতে সে তাই আবার বলিল, এই যে মালতী!

মালতী বলিল, হ্যাঁ, আমিই মালতী। চলুন রাজুদা, যাই। বড্ড দেরি হয়ে গেল।

এতক্ষণ রিণির মুখে মৃদু ও স্পষ্ট একটা বিরক্তির ভাবের উপর মাখানো ছিল সবিনয় ভদ্রতার প্রলেপ, এক মুহূর্তে সমস্ত মুছিয়া গিয়া মুখ তার অন্ধকার হইয়া গেল। এমনভাবে একবার সে ঢোক গিলিল যেন কড়াকড়া কতগুলি অভদ্র কথাই গিলিয়া

ফেলিতেছে। মন চিরিয়া দেওয়ার মতো ধারালো দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড মালতীকে দেখিয়া হঠাৎ সে মুখ ফিরাইল রাজকুমারের দিকে।

শুনে যাও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

মালতী ততক্ষণে আগাইয়া গিয়াছে বাহিরের দরজার কাছে, সেখান হইতে সেও তাগিদ দিয়া বলিল, শিগগির আসুন রাজুদা। দাঁড়াবেন না, চলে আসুন।

সুতরাং রাজকুমারের বিপদের আর সীমা রহিল না। তরুণী দুটির দৃষ্টি-বিনিময় দেখিয়া তার মনে হইতে লাগিল, এই বুঝি একটা খুনোখুনি ব্যাপার ঘটিয়া যায়। রাগে আর আত্মসংযমের চেষ্টায় রিণির সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মালতীর মুখখানা এখনও হাসি হাসি বটে, কিন্তু সে হাসি যেন লড়াই করার ধারালো অস্ত্র। চোখের পলকে চোখের সামনে দুটি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে এমন একটা নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, রাজকুমারের সে অভিজ্ঞতা ছিল না। আড়ালে আড়ালে ভূমিকার অভিনয়টা নিশ্চয় ঘটিয়া গিয়াছে, এ পর্যন্ত সে টেরও পায় নাই। যত আয়োজনই হইয়া থাক, আকাশে তো প্রথম মেঘ দেখা দেয়, তারপর বিদ্যুৎ চমকানোর সংকত পাওয়া যায়, তারপর বজ্রপাত। এ যেন ঠিক বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

কী করা যায় এখন? একজন তাকে ডাকিতেছে অন্দরে, একজন ডাকিতেছে বাহিরে। কারও ডাকে সাড়া দিবার উপায় নাই। নিজেকে যদি দুভাগ করিয়া ফেলা যায়, তবু দুজনকে খুশি করা যাইবে না। এমন হাস্যকর অথচ এমন গুরুতর অকস্থায় কী মানুষ কখনও পড়ে? রাজকুমার বেশ বুঝিতে পারিতেছিল, দুজনের মধ্যে একটা সাময়িক ও কৃত্রিম আপস ঘটাইয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে না। তার কাছে ছেলেমানুষি মনে হইতেছে, কিন্তু এটা ওদের ছেলেমানুষি নয় যে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিবে। তার কথার কোনো দাম এখন ওদের কাছে নাই। আর কিছুই তার কাছে এখন ওরা চায় না, শুধু চায় যে একজনের হুকুম মানিয়া অরেকজনের মাথা সে হেঁট করিয়া দিবে।

রিণি অধীর হইয়া বলিল, এসো?

মালতী হাসিমুখে বলিল, আসুন?

তখন রাজকুমার সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মালতীকে বলিল, এদিকে এসো তো একটু।

মালতী বলিল, আবার ওদিকে কেন? চলুন যাই।

কিন্তু মালতী কাছে আসিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক ভীরু ও কাপুরুষ সৈনিকের মতো রাজকুমার তার পাশ কাটাইয়া পলাইয়া গেল বাহিরে। বাহির হইতে দরজার পিতলের কড়া দুটিতে বাঁধিয়া দিল পকেটের নস্যমাখা ময়লা রুমালটি। গেট পার হইয়া রাস্তায় পা দিয়া তার মনে হইতে লাগিল, মাথাধরাটা একেবারে সারিয়া গিয়াছে। একটু যেন কেবল ঘুরিতেছে মাথাটা, ছেলেবেলায় নাগরদোলায় অনেকক্ষণ পাক খাইয়া মাটিতে দাঁড়াইবার পর যেমন ঘুরিত।

রিণি আর মালতী যে তারপর কামড়াকামড়ি করে নাই, সেটা জানা গেল সন্ধ্যার পর সরসীর মিটিং-এ গিয়া।

রাজকুমার বাড়িতেই ছিল। শ্যামল একেবারে স্যার কে এল-এর গাড়ি লইয়া আসিয়া খবর দিল, সরসী ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, অবিলম্বে যাইতেই হইবে।

মালতীর কাছে আপনি যাবেন না শুনে সরসী একদম খেপে গেছে। শিগগির চলুন।

রাজকুমারের অচেনা এক ভদ্রলোকের প্রকাণ্ড বাড়িতে মিটিং বসি বসি করিতেছিল। জন ত্রিশেক মেয়েপুরুষ উপস্থিত আছে। সকলে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে কিনা সন্দেহ, খুব সম্ভব সরসী সকলকে ঘাড় ধরিয়া টানিয়া আনিয়াছে। রিণি এবং মালতীও উপস্থিত আছে। কারও মুখে আঁচড় কামড়ের দাগ নাই।

রাজকুমার এক ফাঁকে মালতীকে জিজ্ঞাসা করিল, তরপর কী হল?

মালতী হাসিয়া বলিল, কীসের পর?

আমি চলে যাবার পর?

কী আর হবে? ঘন্টাখানেক গল্প করে আমিও চলে এলাম।

রাজকুমার বিশ্বাস করিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল, উঁহু, মিছে কথা।

তখন মালতী তার দুষ্টামির হাসিকে সরল হাসিতে পরিণত করিয়া বলিল, সত্যি মিছে কথা। ওর সঙ্গে এক ঘন্টা গল্প করতে হলে আমি দম আটকে মরে যেতাম না। সত্যি সত্যি কী হল তারপর শুনবেন? চাকর পাশের দরজা দিয়ে গিয়ে রুমালটা খুলে দিল। রিণি বলল, যাচ্ছ নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ যাচ্ছি। বলে চলে এলাম। আপনার রুমালটা আমার কাছে আছে, ওটা আর ফেরত পাচ্ছেন না।

তা না পেলাম। কিন্তু রিণি শুধু যাচ্ছ নাকি বলেছিল, যাচ্ছ নাকি ভাই বলেনি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ও বলল, যাচ্ছ নাকি ভাই, আর আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই যাচ্ছি।

সরসী খুব সম্ভব এ বাড়ির মেয়েদের বুঝাইয়া সভায় আনিতে অন্দরে গিয়াছিল, লজ্জা সংকোচে একান্ত বিপন্না আটদশটি মেয়েবউকে গোরু তাড়ানোর মতো সভায় আনিয়া হাজির করিল। রাজকুমারকে দেখিয়াই অনুযোগ দিয়া বলিল, বেশ মানুষ তো? তোমার বক্তৃতার জন্য মিটিং, তুমি বলে বসলে আসতে পারবে না?

সরসীর রং একটু কালো, দেহের গড়নটি অপরূপ। অতি অপরূপ। কালো মেয়েরও যদি রূপ থাকে, তার মতো রূপসী মেয়ে সহজে চোখে পড়িবে না। সাধারণভাবে কাপড় পরার কোনো এক নতুন কায়দা সে আবিষ্কার করিয়াছে কিনা বলা যায় না, আবরণ যেন তার দেহশ্রীকে ঢাকা দেওয়ার বদলে ছন্দ দিয়াছে।

সমিতি গড়িতে আর মিটিং করিতে সরসী বড়ো ভালোবাসে। ঘরে তার মন বসে না, সারাদিন এইসব ব্যাপার নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কখনও ব্যস্ত হয় না। সব সময় তাকে ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া মনে হয়। এদিক দিয়া সে

মালতীর ঠিক উলটো। মালতী চঞ্চল কিন্তু অলস, তার চাঞ্চল্য নাচের মতো, ছুটাছুটি বা কাজের নামেই তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সরসী একদিনে পঞ্চাশটি জায়গায় কাজে যাইতে পারে অনায়াসে, কিন্তু চলে সে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে কথা, শান্ত দৃষ্টিতে তাকায়, কখনও উত্তেজিত হয় না।

প্রথমে যাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল হঠাৎ কয়েক ঘন্টার নোটিশে তিনি একেবারে শহর ছাড়িয়া পলাইয়া যাওয়ায় স্যার কে এল-কে প্রেসিডেন্ট করা হইয়াছে, সরসী ছাড়া আর কেউ তাকে এতটুকু সভায় আরেকজনের বদলিতে সভাপতিত্ব করিতে রাজি করাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

সরসীই সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানাইল, গাম্ভীর্য ও সহৃদয়তাব্যঞ্জক একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিয়া স্যার কে এল এতক্ষণ যেখানে বসিয়াছিলেন, একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। তারপর সরসী বক্তা ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচয়মূলক কয়েকটি কথা বলিয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

রাজকুমার একদৃষ্টিতে এতক্ষণ সরসীর দিকে চাহিয়া ছিল, শুধু তার এই বসিবার ভঙ্গিটি দেখিবার জন্য। সরসীর ওঠা-বসা চলাফেরার মধ্যে কী যেন একটা আকর্ষণ আছে, কেবলই তার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। সরসীর আকর্ষণ তার কাছে খুব বেশি জোরালো নয়, কিন্তু সরসীর প্রত্যেকটি সর্বাঙ্গীন অঙ্গ সঞ্চালন মৃদু একটা উত্তেজনা জাগাইয়া তাকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

উঠবেন না?

অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য লজ্জিতভাবে রাজকুমার বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্প্রতি সে মাস চারেক মাদ্রাজে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ তাকে মাদ্রাজের নারীজাতির সাধারণ অবস্থা ও প্রগতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। একবার রাজকুমার মালতীর দিকে চাহিল। তাকে সচেতন করিয়া দিয়া মালতী ঘাড়ের পিছনটা খুঁটিতে খুঁটিতে দুষ্টামির হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, এখনও সে হাসি তেমনই স্পষ্ট হইয়া আছে। মালতীর এই হাসি দেখিয়া হঠাৎ সরসীর উপর রাজকুমারের বড়োই রাগ হইয়া গেল। চার মাস একটা দেশে থাকিয়াই সে দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার মতো জ্ঞান একজন সঞ্চয় করিয়া আসিতে পারে, এমন কথা সরসীর মনে হইল কেমন করিয়া? মাথার কি ঠিক নাই মেয়েটার? কী সে বলিবে এখন এতগুলি লোকের সামনে!

কী বলিবে আগে হইতেই কিছু কিছু সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু মনের মধ্যে সব এমনভাবে এখন জড়াইয়া গিয়াছে যে কী বলিয়া আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পাইল না। তিনবার বক্তৃতা শুরু করিয়া তিনবার থামিয়া গেল। কান তার গরম হইয়া উঠিল। লজ্জায় নয়, আতঙ্কে। শেষ পর্যন্ত কিছুই যদি বলিতে না পারে, এমনিভাবে তোতলার মতো দুচারটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া যদি তাকে বসিয়া পড়িতে হয়!

অবরুদ্ধ উত্তেজনায় সভা থমথম করিতেছে, একটা অঘটন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা

দিয়াছে, তারই প্রত্যাশার উত্তেজনা। মরিয়া হইয়া মনে মনে রাজকুমার বলিতে থাকে, একটা কিছু করা দরকার, দু এক সেকেন্ডের মধ্যে তার কিছু করা দরকার, শুধু ওইটুকু সময় হয়তো তার এখনও আছে। বক্তব্য? নাই বা রহিল বক্তব্য তার বক্তৃতার? বড়ো বড়ো কথা নাই বা সে বলিতে পারিল? যা মনে আসে বলিয়া যাক, অন্তত বক্তৃতা তো দেওয়া হইবে। চুপ করিয়া এ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকার চেয়ে সে অনেক ভালো।

একবার সে চাহিল রিণি মালতী সরসীর দিকে, তারপর বলিতে আরম্ভ করিল। মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে? কী সে বলিবে মাদ্রাজের মেয়েদের সম্বন্ধে? যে চিরন্তন রহস্য যুগে যুগে দেশে দেশে নারীজাতিকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে, মাদ্রাজের মেয়েরা তো তার কাছে সে রহস্যের ঘোমটা খুলিয়া তাদের জানিবার বুঝিবার সুযোগ তাকে দেয় নাই। সুতরাং সাধারণ ভাবে দুচারটি কথা বলাই ভালো। গরম কান ঠাণ্ডা হয়, কথার জড়তা কাটিয়া যায়, মৃদু মৃদু রহস্যের সুরে কখনও গম্ভীর ও কখনও হাসিমুখে রাজকুমার বলিয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতে থাকে বটে যে সে আবোলতাবোল বকিতেছে, কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে তার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া সভার মেয়েরা একেবারে অভিভূত হইয়া যায়।

রাজকুমার আসন গ্রহণ করিলে শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারের চেয়ে বয়সে দু এক বছরের ছোটো হইলেও লম্বা চওড়া চেহারা আর মুখের ভারিক্কি গড়নের জন্য তাকেই বড়ো দেখায়। এতক্ষণ সে মালতীর পাশে মুখভার করিয়া বসিয়াছিল। তীব্রদৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড়বিড় করিয়া মন্তব্য করিতেছিল : পাগলের মতো কী যে বকে লোকটা। মাথা খারাপ নাকি? যত সব চালবাজি।

মালতী ছাড়া আর কেউ মন্তব্যগুলি শুনিতে পাইতেছিল কি না বলা যায় না, একটা অত্যধিক কড়া কথা কানে যাওয়ায় মালতী একবার শুধু বলিয়াছিল : কী বললেন?

আপনাকে বলিনি। রাজুদা কী রকম আবোলতাবোল বকছেন, শুনছেন তো? দাঁড়ান, ওঁর বাহাদুরি ভেঙে দিচ্ছি। মেয়েদের ধোঁকা দিয়ে—

কী করবেন?

দেখুন না কী করি।

ছোটোছেলের স্বপ্ন-কাম্য খেলনা পাওয়ার মতো রাজকুমারকে জব্দ করার কী যেন একটা সুযোগ পাইয়া সে সযত্নে পুষিয়া রাখিতেছে, ফাঁক করিতে চায় না, ভাগ দিতে চায় না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে তার উদ্দেশ্য কতকটা আন্দাজ করিয়া মালতী চাপা গলায় বলিল, না না থাক, বসুন। তার পাঞ্জাবির প্রান্ত ধরিয়া আলগোছে একটু টানও সে দিল, কিন্তু শ্যামল বসিল না।

আপনি কিছু বলবেন শ্যামলবাবু? এদিকে আসুন। সরসী বলিল।

এখান থেকেই বলি?

আচ্ছা বলুন।

অনেকগুলি চোখের, তার মধ্যে বেশির ভাগ মেয়েলি চোখ, প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টি মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অনুভব করিয়া এক মুহূর্তের জন্য শ্যামলের উৎসাহ যেন উপিয়া গেল। এখন মালতী আর একবার তার পাঞ্জাবির কোণ ধরিয়া একটু টানিলেই সে হয়তো বসিয়া পড়িত। অসহায়ের মতো এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তাঁর চোখে পড়িয়া গেল, রাজকুমারের মুখে মৃদু অমায়িক হাসি ফুটিয়া আছে, ছোটোছেলে বাহাদুরি করিতে গেলে স্নেহশীল উদার গুরুজন যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

· দেখিয়া শ্যামলের মাথা গরম হইয়া গেল।

আমার কথা শুনে আপনারা অনেকেই ক্ষুন্ন হবেন। আমাকে কয়েকটি অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। বিশ্বনারী বা মাদ্রাজি মহিলাদের সম্বন্ধে নতুন কিছু আপনাদের শোনাবার জন্য আমি উঠে দাঁড়াইনি, রাজকুমারবাবুর বক্তৃতার কয়েকটা মারাত্মক ভুল দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে রাজকুমারবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি, উনি আমার অনেকদিনের বন্ধু—

রাজকুমারের মুখে আর হাসির চিহ্নও ছিল না। কী সর্বনাশ, এতগুলি লোকের সামনে তাকে অপদস্থ করার জন্য শ্যামল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! নিরীহ শান্ত ভালোমানুষ শ্যামল! রাজকুমারের কোনো সন্দেহই ছিল না যে সে অনেক ভুল করিয়াছে। এখন তার আতঙ্ক জন্মিয়া গেল যে ভুলগুলি নিশ্চয় সাধারণ তুচ্ছ ভুল নয়, শ্যামল চোখে আঙুল দিয়া ভুলগুলি দেখাইয়া দিলে তার আর মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিবার উপায় থাকিবে না। সাংঘাতিক হাস্যকর ভুল না হইলে শ্যামল কি সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিত? না জানি কী ভাবিবে সকলে, মনে মনে কত হাসিবে, তার জ্ঞান বুদ্ধি অভিজ্ঞতার খোলসটা যখন শ্যামল ছিঁড়িয়া ফেলিতে থাকিবে। রাজকুমারের সর্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। এতদিন সে জানিত, তার সম্বন্ধে মানুষ কী ধারণা পোষণ করে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নাই, এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি অগভীর নরনারীর মতামতকে সে গ্রাহ্যও করে না। এক মুহূর্ত আগেও সে নিজের কাছে স্বীকার করিত না বক্তৃতা না জানিলে মন তার খারাপ হইয়া যাইবে। এখন শ্যামলের উদ্যত আঘাতে নিজের বাহাদুরির প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, লোকে তাকে কী ভাবে তা কত দামি তার নিজের কাছে। অবজ্ঞার ভয়ে মরণ কামনা করার মতো দামি সকলের তাকে বাহাদুর মনে করা।

রাজকুমারের অপরিচিত একটি মেয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেখিলেই বুঝা যায় সে খাঁটি মাদ্রাজি মেয়ে। আর দশজন মেয়ের মধ্যে বসিয়াছিল বলিয়া এতক্ষণ সে রাজকুমারের নজরে পড়ে নাই, আসরে খাঁটি একজন মাদ্রাজি মেয়ে উপস্থিত আছে জানিলে রাজকুমারের বক্তৃতাটা আজ কী রকম দাঁড়াইত কে জানে!

মেয়েটি বলিল, রাজকুমারবাবু নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন। ভুল

দেখিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে কি? এটা ডিবেটিং সোসাইটির মিটিং নয় আশা করি?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ঠিক তো, রাজকুমার যাই বলিয়া থাক, তার বক্তৃতার সমালোচনা করিবার কী অধিকার শ্যামলের আছে?

স্যার কে এল হাসিমুখে বলিলেন, শ্যামল রাজকুমারের ভুল দেখিয়ে দিচ্ছে না, আমাদের যাতে ভুল ধারণা না জন্মায় সে জন্য নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছে। কী বল শ্যামল?

শ্যামল তাড়াতাড়ি বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন ধরুন রাজকুমারবাবু বিশ্বের নারীজাতির বিস্ময়কর মিলের কথা বলেছেন। পৃথিবীর যে কোনো একটি দেশের পুরুষের সঙ্গে অন্য যে কোনো একটি দেশের পুরুষের যতটা পার্থক্য দেখা যায়, দুটি দেশের মেয়েদের পার্থক্য নাকি তার চেয়ে অনেক কম। কথাটা কি ঠিক? আমাদের দেশের পুরুষেরা যখন বিলাতি পুরুষদের সাজপোশাক চালচলন অনুকরণ করে তখন অতটা খারাপ দেখায় না, কিন্তু মেয়েরা ওদেশের মেয়েদের অনুকরণ করলে সেটা উদ্ভট আর হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় পুরুষ সহজেই সাজপোশাক চালচলনে তো বটেই, প্রকৃতিতে পর্যন্ত সাহেব হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মেয়েরা কোনোদিন মেমসাহেব হতে পারে না। রাজকুমারবাবু যে বিশ্বের নারীজাতির কথা বলেছিলেন তার কারণ বিশ্ব শব্দের একটা মোহ আছে, প্রথমে সকলকে বিশ্বের কথাটা মনে পড়িয়ে দিলে সকলের মন উদার হয়ে যায়, বাজে কথাও সকলে বড়ো বড়ো অর্থে গ্রহণ করে। ও একটা প্যাঁচ ছাড়া কিছু নয়। রাজকুমারবাবু—

মাদ্রাজি মেয়েটি আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ জানাইল, এটা কি ব্যক্তিগত আক্রমণ হচ্ছে না?

স্যার কে এল হাসিমুখেই সায় দিয়া বলিলেন খানিকটা হচ্ছে বইকী।

শ্যামল জোর দিয়ে বলিল, না না, ব্যক্তিগত আক্রমণ হবে কেন, রাজকুমারবাবুর সঙ্গে তো আমার শত্রুতা নেই। আমি বলছিলাম, মাদ্রাজের নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে রাজকুমারবাবুর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, তিনি তাই বিশ্বের নারীজাতির কথা তুলেছিলেন, সমগ্রতার অস্পষ্টতায় যাতে খুঁটিনাটির অভাবটা চাপা পড়ে যায়। মাদ্রাজের নারীরাও বিশ্বের নারীজাতির অন্তর্গত বইকী! মাদ্রাজের নারীদের সম্বন্ধে রাজকুমারবাবু যে সব কথা বলেছেন তার অধিকাংশই বিশ্বের যে কোনো দেশের নারীজাতির সম্বন্ধে বলা যায়। মাদ্রাজি মেয়েদের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রাজকুমারবাবু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যুগোপযোগী সংস্কারকে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করবার অশিক্ষিতপটুতা তাদের নাকি বিস্ময়কর। স্কুল কলেজের শিক্ষার হিসাবে তারা নাকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, বিশেষ করে বাংলার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছেন, কিন্তু জীবনযাত্রাকে নতুন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় সব প্রদেশকে হার মানিয়েছেন। এ ধারণা রাজকুমারবাবু যে কোথায় পেলেন কল্পনা করা কঠিন। মাদ্রাজের মেয়েরা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে

বিশেষ কোনো সংস্কারের আমদানি করেছেন, অথবা ও বিষয়ে তাঁদের উল্লেখযোগ্য উৎসাহ দেখা গিয়েছে বলে তো মনে হয় না। নতুন আলো চোখে লাগা আর সেই আলোয় নতুন দৃষ্টিতে জীবনকে যাচাই করার অসুবিধা ও সুযোগের অভাব অন্য সব প্রদেশের মতো মাদ্রাজের মেয়েদেরও কিছুমাত্র কম নয়।

রাজকুমার চুপ করিয়া শুনিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, এইবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সব সময় তার মুখে যে মৃদু একটু বিবর্ণতার ছাপ থাকে, রাগে এখন তাহা মুছিয়া গিয়াছে। তবু সে শান্ত কণ্ঠেই বলিল, আমার কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি শ্যামল। আমি বলেছি অন্য প্রদেশের চেয়ে মাদ্রাজে মেয়েরা পরিবর্তনকে গ্রহণ করছে একটু ব্যাপকভাবে, সামান্য হলেও তার ব্যাপ্তি আছে। বাংলায় মেয়েদের খুব সামান্য একটা অংশ অনেক এগিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা এত কম যে ধর্তব্যের মধ্যে বলা চলে না। বাকি সকলে অর্থাৎ বাংলা দেশের মেয়ে বলতে যাদের বুঝায় তারা পড়ে আছে একেবারে পিছনে। মাদ্রাজের মেয়েদের একটা ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ এ ভাবে এগিয়ে না গিয়ে সকলে মিলে অল্পঅল্প অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন হয়েছে জানো, বাংলায় একটুখানি নারীপ্রগতি যেন সঞ্চিত হয়েছে কাচের সরু নলে, গভীরতা আছে কিন্তু ব্যাপ্তি নেই! আর মাদ্রাজের নারীপ্রগতিটুকু সঞ্চিত হয়েছে থালায়, গভীরতা নেই কিন্তু বিস্তার আছে। আমি মনে করি, মৃতদেহের একটা আঙুল প্রাণ পেয়ে যতই তিড়িংতিড়িং করে লাফিয়ে জীবনের প্রমাণ দিক, তার চেয়ে সর্বাঙ্গে একটুখানি প্রাণ সঞ্চার হয়ে শরীরটা যদি এক ডিগ্রিও গরম হয়, তাও অনেক ভালো।

রাজকুমার ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার ডবল উপমার ধাক্কায় শ্যামলের এতক্ষণের বড়ো বড়ো কথাগুলি যেন ধূলা হইয়া বাতাসে উড়িয়া গেল।

কিন্তু শ্যামল তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে জব্দ করিতে উঠিয়া নিজে জব্দ হইয়া আসন গ্রহণ করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সে বলিতে গেল, রাজকুমারবাবু যে সব—

রিণি তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনও মাদ্রাজে গেছেন শ্যামলবাবু?

শ্যামল দমিয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি—? না, যাইনি।

ও! কিছু মনে করবেন না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

শ্যামল বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, সুযোগ পাইল না। পাঞ্জাবির ডানদিকের পকেটে তার এমন জোরে টান পড়িল যে আপনা হইতেই সে বসিয়া পড়িল।

মালতী বলিল, চুপ করে বসে থাকুন।

কেন ? আমার যা বলবার আছে—

চুপ। একটি কথা নয়। মুখ বুঁজে বসে থাকুন।

না বসব না। আমি যাই।

বসে থাকুন। সকলের সঙ্গে যাবেন।

মালতীর চাপা গলার তীব্র ধমকে শ্যামল যেন শিথিল, নিস্তেজ হইয়া গেল।

তারপর রিণি যখন সভাশেষের গান ধরিয়াছে, মেয়েরা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে কথা আরম্ভ করিয়াছে, মাদ্রাজি মেয়েটির সঙ্গে সরসী রাজকুমারের পরিচয় করাইয়া দিল। মেয়েটির নাম রুক্মিণী, সরসীর সঙ্গে পড়িত। এখন নিজে আর পড়ে না, একটি স্কুলে মেয়েদের পড়ায়।

আপনি সুন্দর বলেছেন।

রাজকুমার সবিনয়ে হাসিল।

আমি ভাবছিলাম একজন বাঙালি ভদ্রলোক আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বলবেন, এ তো ভারী আশ্চর্য, আমাদের দেশের মেয়েদের কথা তিনি ভালো করে জানবেন কী করে? খুব আগ্রহ নিয়ে তাই আপনার কথা শুনতে এসেছিলাম। ভারী খুশি হয়েছি আপনার বক্তৃতা শুনে। কেবল একটা কথা—দ্বিধা ও সংকোচের ভঙ্গিতে রুক্মিণী এতক্ষণ ইতস্তত করিল যে রাজকুমারের মনে হইল কথাটা বুঝি শেষ পর্যন্ত না বলাই সে ঠিক করিয়াছে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে। আচ্ছা, মাদ্রাজের দুচার জন মেয়েও কি বাংলার কাচের নলের মেয়েদের—মানে, যাঁরা খুব এগিয়ে গেছেন তাঁদের সমান হতে পারেননি?

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা পেরেছেন বইকী, অনেকেই পেরেছেন।

রুক্মিণী খুশি হইয়া বলিল, থ্যাঙ্কস।

তাই বটে। একজন মাদ্রাজি মেয়েও যদি চরম-কালচারি বাঙালি মেয়েদের সমান না হইতে পারিয়া থাকে, রুক্মিণী তবে দাঁড়ায় কোথায়? রাজকুমার মনে মনে ভাবিল, রুক্মিণী মেয়েটি বেশ।

সকলের আগে স্যার কে এল বিদায় নিলেন। তাঁর অম্বলের অসুখ, লাইট রিফ্রেশমেন্টও সহ্য হইবে না। তা ছাড়া, এই সব ছেলেমানুষদের সভায় যদি বা এতক্ষণ থাকা গিয়াছিল, সভা এখন বৈঠকে পরিণত হইয়াছে, এখন আর থাকা চলে না। তাঁর কাজও আছে।

রাজকুমার বলিল, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

পথে স্যার কে এল আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন, উপভোগ্য একটা রসিকতার রস যেন মন হইতে তার কিছুতেই মিলাইয়া যাইতেছে না।

অনেকদিন আগে এমনই একটা আসরে উপস্থিত ছিলাম রাজু। বিলাতে।

এমনই আসর?

অবিকল এই রকম। ইয়ং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। আমার মতোই একজন আধবুড়োকে প্রেসিডেন্ট করেছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ রাজু? অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সভা করে কিন্তু প্রেসিডেন্ট করে বুড়োকে? কম বয়সি কাউকে প্রেসিডেন্ট করতে বোধ হয় তাদের হিংসা হয়। কিংবা হয়তো প্রেসিডেন্ট বলতেই এমন একটা গম্ভীর

জবরদস্ত মানুষ বোঝায় যে বুড়ো ছাড়া প্রেসিডেন্টের আসনে কাউকে বসাবার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

রাজকুমার হাসিল।—বর্ণনাটা কিন্তু আপনার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

স্যার কে এল-ও হাসিলেন। কিছু কিছু খাপ খায় বইকী। বয়স তো হয়েছে, আমি হলাম অতীতের জীব, তোমাদের কাছে আমি এখন বুড়ো, স্থিতি লাভ করেছি। আমাকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চপলতা করা কত সুবিধা বলো তো।

চপলতা স্যার কে এল?

চপলতা রাজু, নিছক চপলতা। তোমাদের কপাল ভালো, এত সহজে এত সস্তায় চপল হতে পার। আমার আধ বোতল শ্যাম্পেন দরকার হয়, তিন চারটা ককটেল। তাও কি তোমাদের মতো চপলতা আসে। হয় দার্শনিক চিন্তা আসে, নয় ঘুম পায়।

স্যার কে এল-এর বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড়াইল। স্যার কে এল কিন্তু নামিলেন না।

এক কাপ কফি খেয়ে যাবে রাজু?

কফি? কফি খেলে রাত্রে ঘুম হয় না।

রাজকুমার নামিয়া গেল। আসরে তার ভালো লাগে নাই, বক্তৃতা শুনিয়া সকলে খুব হইচই করিয়াছে বটে শেষের দিকে, নিজে কিন্তু সে ভুলিতে পারে নাই আগাগোড়া সবটাই তার ফাঁকি; সকলকে ভাঁওতা দিয়া সে হাততালি পাইয়াছে এবং একটু চিন্তা করে এমন যারা আসরে ছিল তাদের কাছে তার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সাফল্যের আনন্দের সঙ্গে সে তাই লজ্জাও বোধ করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। শ্যামলের ব্যবহারেও মনটা বড়ো বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তবু সেখানে যেন বাতাসে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ানোর মতো হালকা মনে হইয়াছিল নিজেকে। তখন বুঝিতে পারে নাই। এখন স্যার কে এল-এর সঙ্গে এতটুকু পথ গাড়িতে আসিয়া এমন ভারী বোধ হইতেছে নিজ সত্তাকে যে সাধ যাইতেছে ফুটপাতে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ে।

স্যার কে এল ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, ক্লাব।

বাড়ির দরজা পর্যন্ত আসিয়া স্যার কে এল ফিরিয়া গেলেন ক্লাবে এবং কোথাও যাইবার কথা ভাবিতে না পারিয়া রাজকুমার ফিরিয়া গেল নিজের ঘরে।

আবার কি মাথা ধরিয়াছে তার? কেমন একটা ভোঁতা যন্ত্রণা বোধ হইতেছে মাথার মধ্যে। চারকোনা ঘরের বাতাস যেন চারিদিক হইতে মাথায় তার চাপ দিতেছে।

রাজকুমার মালতীকে পড়াইতেছিল।

সারাদিন অবিরাম বর্ষণের পর বৃষ্টি থামিয়াছিল সন্ধ্যার একটু আগে, কিন্তু মেঘ তখনও আকাশ ঢাকিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। যে কোনো মুহূর্তে আবার

ঝমাঝম ধারাপাত শুরু হইয়া যাইতে পারে।

প্রথমে মালতী ভাবিয়াছিল, আজ কি রাজকুমার এই বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাকে পড়াইতে আসিবে? তারপর আবার তার মনে হইয়াছিল, পড়াইতে যে রকম ভালোবাসে রাজকুমার, যতটুকু সময়ের জন্যই হোক বৃষ্টিটাও যখন থামিয়াছে, হয়তো সে আসিতেও পারে।

তাই, রাজকুমার আসিবে কি আসিবে না ঠিক না থাকায় দুপুরের গুমোটের স্বেদে আত্মগ্লানিময় শরীরটিকে সযত্ন প্রসাধনে একটু চাঙা করিয়া তুলিয়া পড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

না আসে রাজকুমার নাই আসিবে। যদি আসে—

রাজকুমার আসিল এবং কোনো রকম ভূমিকা না করিয়াই পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল পড়িতে নয় পড়াইতেও সে খুব পটু। মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অনেক সময় কথার অভাবে তাকে মূক হইয়া থাকিতে হয় কিন্তু আলাপ আলোচনার উপরের স্তরের চিন্তাগুলিকে খুব সহজেই শব্দের রূপান্তর দিতে পারে। কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার সময় সে মশগুল হইয়া যায়।

পড়ার সময় মালতীও কোনো রকম দুষ্টামি করে না। ইচ্ছাও হয় না, সাহসও পায় না। এ সময় বাজে কথায় রাজকুমার বড়ো বিরক্ত হয়। একদিন স্বভাব দোষে অতি হালকা আর অতি সূক্ষ্ম একটা খোঁচা দেওয়া রসিকতা করিয়া বসায় রাগ করিয়া রাজকুমার তিন দিন তাকে পড়াইতে আসে নাই। পড়ানোর জন্য রাজকুমার বেতন পায়, তবু।

বৃষ্টি না নামিলে হয়তো রাজকুমার মালতীকে আজ পড়াইতে আসিত না।

বিশ্বজগতের সম্রাট আজ আর সে নয়, সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি আসার সময় পর্যন্ত সে যা ছিল। মানুষের মনের এটা কী জটিল রাজনীতির ব্যাপার কে জানে, সারাদিনের অবিরাম বর্ষণ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াকে উপলক্ষ করিয়াই এক মুহূর্তে রাজা ভিখারি হইয়া যায়। বেশ ছিল সে সারাদিন। সকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখিয়াছিল, রোদ নাই, জমাট বাঁধা কালো মেঘের গভীর ছায়া নামিয়াছে। কী যে তৃপ্তি বোধ হইয়াছিল রাজকুমারের তারপর বৃষ্টি নামিতে জাগিয়াছিল উল্লাস, জীবনে ফাঁকি ছিল না, অপূর্ণতা ছিল না, নিজের ঘরটিতে বন্দী হইয়া থাকিয়াও মনে হইয়াছিল বাহিরের যে জগৎ জলে ভাসিয়া যাইতেছে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কীসের? ঘরে বন্দী থাক দেহ, কোটি বছর অমনই তৃপ্তি আর আনন্দের সঙ্গে মন রাজত্ব করুক নিজের রাজ্যে।

তারপর বৃষ্টি থামিয়া গেল। মেঘের ওপারেও তখন রোদ নাই। মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ঢাকিয়া যাইতেছে গাঢ়তর রাত্রির ছায়ায়। তখন মনে হইয়াছিল, বৃষ্টি যখন নাই, এবার বাহির হওয়া যাইতে পারে—বাড়ির বাহিরে যে জগতে গিরি, রিণি, সরসী আর

মালতী বাস করে সেই জগতে। কিন্তু এই বাদল দিনের শেষে বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হওয়া যায়, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো যায় যত খুশি, ওদের কারও বাড়ি যাওয়ার অজুহাত তো তার নাই। যার কাছেই যাক, সে ভাবিবে ভিখারি আসিয়াছে : রাজাকে ভিখারি সাজিয়া আসিতে দেখিয়া শুধু কথা ও হাসি ভিক্ষা দিতেই কত যে কার্পণ্য করিবে কে জানে!

ওরা কেউ তো বুঝিবে না কী ভাবে সারাদিন ঘরে আটক থাকিয়াও একাই সে অনেক হইয়া নিজের জগৎ ভরিয়া রাখিয়াছিল, আবার কী ভাবে সে একা হইয়া গিয়াছে, চার জনের একজনের সঙ্গেও দুটি কথা বিনিময়ের সুযোগ পর্যন্ত নাই বলিয়া মন তার কেমন করিতেছে।

না বুঝিলে কী আসিয়া যায়? নিজেকে সে যে ভুলিতে আসিয়াছে এ কথা মনে করার বদলে যদি অন্যকে ভুলাইতে আসিয়াছে ভাবে, কী ক্ষতি আছে তাতে? মনে মনে না হয় ওরা কেউ একটু হাসিবে না হয় বলিবে মনে মনে, হে আত্মভোলা মহাপুরুষ, তোমার এত দিনের উদাসীন অবহেলার ফাঁকিটা তবে আজ ধরা পড়িয়া গেল? হে সিনিক, শেষ পর্যন্ত আমিই তবে তোমাকে রোমান্সের মধুতে ডুবাইয়া দিয়াছি? এই হাসি হাসিবার এবং এই কথা বলিবার অধিকার ওদের চিরন্তন, একদিন না হয় অধিকারটা সে খাটাইতে দিল?

কিন্তু মন মানে নাই রাজকুমারের। উপযাচকের কলঙ্ক জুটিবার ছেলেমানুষি ভয়ের জন্য নয়, এই কলঙ্ক যে আরোপ করিবে তারই ভয়ে। যে জটিল সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে ওদের সঙ্গে তার জট খুলিবে না, কেউ সহজ হইতে পারিবে না। একা থাকিতে না পারিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু এ একাকীত্ব যে তার কাছে অর্থহীন, দুর্বোধ্য রহস্যের মতো কাছে বসিয়া কথা বলিলে, কাছে আসিয়া এক হওয়ার খেলা খেলিলে যে এই একাকীত্বের দুঃখ তার ঘুচিবে না, এ সত্য অন্যের কাছে কোনো মতেই সত্য হইয়া উঠিবে না। মানুষ দুটি থাকিবে আড়ালে, একের সত্যতা শুধু পীড়ন করিবে অপরকে।

কেবল মালতীর কাছে যাওয়ার একটা বাস্তব অজুহাত আছে। মালতীও অনেক কিছু মনে করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পীড়ন করার সুযোগ পাইবে না। বেতন পায় তাই বাদল অগ্রাহ্য করিয়া পড়াইতে আসিয়াছে, এই বর্ম গায়ে আঁটিয়া কিছুক্ষণ মালতীর সঙ্গে কাটাইতে পারিবে। তা ছাড়া, কথা আর হাসি ওখানে দরকার হইবে না, বাড়তি অস্বস্তির যন্ত্রণা জুটিবে না। পড়ানো তার কাজ—বেতনভোগীর নিছক কর্তব্য পালন করা। সেটুকু করিলেই চলিবে।

বাহিরে আবার যখন বৃষ্টি নামিল, ঘরের মধ্যে রাজকুমার বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেল কোথায় বসিয়া কাকে সে পড়াইতেছে। শুকনো কথার শব্দ জলের শব্দে খানিকটা চাপা পড়িয়া গেল। ভালো করিয়া শুনিবার জন্য টেবিলের উপর হাত রাখিয়া মালতী সামনের দিকে আরও ঝুঁকিয়া বসিল।

রাজকুমার হঠাৎ থামিয়া গেল, সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, তুমি কিছু শুনছো না মালতী।

শুনছি। সত্যি শুনছি। কী করে জানলেন শুনছি না?

আমি জানতে পারি।

মালতী নীরবে আস্তে আস্তে কয়েকবার মাথা নাড়িল। অর্থাৎ সেটা সম্ভব নয়, কিছু জানিবার ক্ষমতা রাজকুমারের নাই।

রাজকুমার শ্রান্তভাবে একটু হাসিল। যাকগে, আজ পড়াতে ভালো লাগছে না।

ভালো লাগছে না?

মালতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসু চোখ তুলিল। অর্থাৎ তাই যদি হয়, এতক্ষণ মশগুল হইয়া তুমি তবে কী করিতেছিলে?

রাজকুমার চেয়ারটা পিছনে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পুবের দেওয়াল ঘেঁসিয়া দুটি বই-ভরা আলমারি অযথা গাম্ভীর্যের ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, রাজকুমারের মনের গাম্ভীর্যের রূপধরা ব্যঙ্গের মতো হাজার মানুষের মনের যে গঞ্জনাকে প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া সে মনকে ভারী করিয়াছে, আলমারির এই বইগুলির চেয়ে তার ওজন কম নয়। চাপ দেওয়া ওজন—বুকের উপর বইগুলি স্তূপ করিয়া রাখিলে শুধু কাগজের যে চাপে পাঁজর ভাঙিয়া যাইতে চাহিবে, অদেহী অক্ষরের পেষণ তার চেয়ে ভারী।

একদিকের দুটি জানালাই খোলা। এদিক দিয়া ছাঁট আসে না। পাশের একতলা বাড়ির ফাঁকা ছাতে বৃষ্টিধারা আছড়াইয়া পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। বইয়ের আলমারি ছাড়িয়া রাজকুমার জানালায় গেল আবার ফিরিয়া আসিল।

এখন যাই মালতী।

বৃষ্টি পড়ছে যে?

তাই বটে, বৃষ্টি পড়িতেছে। মালতী যখন মনে পড়াইয়া দিয়াছে এখন বৃষ্টি মাথায় করিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব। মালতীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া রাজকুমার বলিল, নোট নিয়েছ?

চতুষ্কোণ টেবিলের অন্য তিনদিকের যেখানে খুশি দাঁড়াইয়া এ প্রশ্ন করা চলিত, মালতীর খাতাও দেখা চলিত। কিন্তু চতুষ্কোণ ঘরের মতোই চতুষ্কোণ টেবিলও মাঝে মাঝে প্রান্তরের বিস্তৃতি পায়, এত দূর মনে হয় একটি প্রান্ত হইতে আর একটি প্রান্ত।

মালতীর খোলা খাতার সাদা পৃষ্ঠা দুটিতে একটি অক্ষরও লেখা হয় নাই, দুটি পৃষ্ঠার যোগরেখার উপর লিখিবার কলমটি পড়িয়া আছে। রাজকুমার হাত বাড়াইয়া পাতা উলটাইয়া দেখিতে গেল অন্য পৃষ্ঠায় কিছু লেখা আছে কিনা। তার বুকে লাগিয়া মালতীর মাথাটিও নত হইয়া গেল। রাজকুমারের আঙুলে তারের মতো সরু একটি আংটি, তাতে এক বিন্দু জলের মতো একটি পাথর। দুহাতে সেই আংটি পরা হাতটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আরও মাথা নামাইয়া আংটির সেই পাথরটিতে মুখ ঠেকাইয়া মালতী চুপ করিয়া

পড়িয়া রহিল। সে যেন পিপাসায় কাতর, জল-বিন্দুর মতো ওই পাথরটি পান করিয়াই পিপাসা মিটাইতে চায়।

তখন এক কোমল অনুভূতির বন্যায় রাজকুমারের চিন্তা আর অনুভূতির জগৎ ভাসিয়া গেল, মনে হইল শুধু মমতায় এবার তার মরণ হইবে। মালতীর একটি চুলের জন্য তার এ কী মায়া জাগিয়াছে! এক মুহূর্তের বেশি সহ্য করাও কঠিন এমন এই আত্মবিলোপ। মালতীকে বিশ্বজগতের রানি করিয়া দিলে তার সাধ মিটিবে না, ফুলের দুর্গে লুকাইয়া রাখিলে ভয় কমিবে না, তাই শুধু মালতী ছাড়া কিছুই সে রাখিতে চায় না, নিজেকে পর্যন্ত নয়।

কয়েক মুহূর্তে শ্রান্ত হইয়াই সে যেন ধীরে ধীরে মালতীর চুলে মাথা রাখিল।

মুখ তোলো, মালতী।

মালতী মুখ তুলিল। তারপর ব্যস্তভাবে উঠিয়া সরিয়া গেল।

রাজকুমার বলিল, কী হয়েছে মালতী?

মালতী মৃদুস্বরে বলিল, শ্যামল এসেছে।

কোথায় শ্যামল?

মালতী ততক্ষণে খোলা দরজার কাছে আগাইয়া গিয়াছে। দরজার বাহিরে গিয়া সে ডাকিল, শ্যামল?

শ্যামল চলিয়া যাইতেছিল, বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল। জামা কাপড় তার ভিজিয়া চুপসিয়া গিয়াছে। দরজার বাঁ দিকের আধভেজানো জানালাটির নীচে মেঝেতে অনেকখানি জল জমিয়া আছে। শ্যামলের গা বাহিয়া তখনও জল পড়িতেছিল।

মালতী বলিল, এ কী ব্যাপার শ্যামল?

শ্যামল বলিল, একটা ফোন করতে এসেছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামল—

রাজকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। সকলের আগে তার চোখে পড়িল জলে ভেজা শ্যামলের উদভ্রান্ত ভাব। শিশু যেন হঠাৎ ভয় পাইয়া দিশেহারা হইয়া গিয়াছে।

মালতী বলিল, বৃষ্টি নেমেছে অনেকক্ষণ, এতক্ষণ ভিজে কাপড়ে কী করছিলে? বৃষ্টি যখন নামল, বাড়ি ফিরে গেলে না কেন? রাস্তায় ভিজে গেলে, তবু ফোন করতে এলে কী বলে?

জেরায় কাতর শ্যামল বলিল, দরকারি ফোন কি না, ভাবলাম একটু ভিজলে আর কী হবে। একটা শুকনো কাপড় আর গেঞ্জি দেবে আমাকে?

মালতী দ্বিধা করিল, যতক্ষণে দ্বিধার ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে, ততক্ষণ তারপর বলিল, শুকনো কাপড় দিয়ে কী করবে, রাস্তায় নামলেই তো কাপড় আবার ভিজে যাবে। একেবারে বাড়ি গিয়ে কাপড় ছাড়ো। বড়ো ছেলেমানুষ তুমি,—সত্যি।

একখানা শুকনো কাপড় দিয়া বৃষ্টি ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে না দিয়া ভিজা কাপড়ে তাকে একরকম তাড়াইয়া দেওয়া হইল। শ্যামল হয় মালতীর কথার মানেই

বুঝিতে পারিল না অথবা বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না, এমনই এক অদ্ভুত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সে খানিকক্ষণ মালতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর নীরবে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে গিয়া টেবিলের দুপাশের দুটি চেয়ারে বসিয়া দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। মালতীর মুখখানি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই অস্ফুটস্বরে বলিল, শ্যামল সব দেখেছে।

সব? সব মানে কী? রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া গেল। জানালা দিয়ে দেখছিল?

হ্যাঁ তুমি যখন পড়াও, প্রায়ই এসে বারান্দায় কেউ না থাকলে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়।

রাজকুমার আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। প্রাণপণে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, তার মানে—?

মালতী সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই। এমন ছেলেমানুষ আর দেখিনি। একটু বয়স বাড়লেই এ ভাবটা কেটে যাবে জানি, তবু এমন বিশ্রী লাগে মাঝে মাঝে। এ সব নীরব পূজার ন্যাকামি কোত্থেকে যে শেখে ছেলেরা।

ছেলেরা! যাদের সঙ্গে কলেজে পড়ে মালতী তারা কচি ছেলের দলে গিয়া পড়িয়াছে, এতই সে বুড়ি। রাজকুমারের এবার আপনা হইতেই হাসি আসিল।

একখানা শুকনো কাপড় চাইল, তাও দিলে না?

খুব অন্যায় হয়ে গেছে, না? একটু উদ্‌বেগের সঙ্গেই মালতী জিজ্ঞাসা করিল। তারপর মাথা নিচু করিয়া বলিল, দিতাম, অন্যদিন হলে দিতাম। আজ কাপড় দিলে বসে থেকে আমাদের জ্বালাতন করত।

আর পড়বে?

না। কী হবে পড়ে?

বলিয়া অনেকক্ষণ পরে মালতী তার দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসিল।

বৃষ্টি থামিল রাত্রি দশটার পর।

রাস্তায় কিছু কিছু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, জুতা ভিজাইয়া বাড়ির দিকে চলিতে চলিতে নিজেকে বড়ো নোংরা মনে হইতে লাগিল রাজকুমারের। পথের সমস্ত ময়লা যেন জলে ধুইয়া তারই পায়ে লাগিতেছে।

গলির মধ্যে তার বাড়ির সামনে শ্যামলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রাজকুমার ঠিক আঘাত পাওয়ার মতোই চমক বোধ করিল। এখনও শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া চপচপ করিতেছে। মালতীর বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর হইতে এতক্ষণ সে কি এখানে দাঁড়াইয়া আছে? অথবা বাড়ি হইতে শুকনো জামাকাপড় পরিয়া আসিয়া জলে ভিজিয়াছে?

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে রাজকুমারবাবু।

এসো না, ভেতরে এসো।

না, এখানে দাঁড়িয়েই বলি।

রাজকুমার একটু রাগ করিয়া বলিল, শ্যামল, মালতীর কথা বলবে বুঝতে পারছি, কিন্তু ভিজে কাপড়ে জলকাদায় দাঁড়িয়ে না বললে কি চলবে না তোমার? এমন ছেলেমানুষ তো তুমি ছিলে না, কী হয়েছে তোমার আজকাল? বলিয়া রাজকুমার দরজার কড়া নাড়িল।

দরজা খুলিবার সময়টুকুর মধ্যে শ্যামল একবার কয়েক পা আগাইয়া আবার আগের জায়গায় গিয়া দাঁড়ায়। যেন ঠিক করিতে পারিতেছে না রাজকুমারের বাড়িতে ঢুকিবে কি ঢুকিবে না। ভিতরে গিয়া তাকে রাজকুমারের একবার ডাকিতে হয়।

শ্যামল আগেও কয়েকবার রাজকুমারের কাছে আসিয়াছে, মনোরমা তাকে চিনিত। তাকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠে, ভিজে চুপচুপে হয়ে এত রাতে তুমি কোথা থেকে এলে ভাই? ও কালী, কালী, তোর রাজুদার ঘর থেকে একখানা শুকনো কাপড় এনে দে শিগগির।

গিরির সমবয়সি একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়। গিরির চেয়ে তার স্বাস্থ্য ভালো, বোধ হয় সেই জন্যই তার মুখে কচি ডাবের খানিকটা স্নিগ্ধ লাবণ্য আছে। মনোরমার তাগিদ সহিতে না পারিয়া রাজকুমার সরসীর সভার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর গিয়া কালীকে নিয়া আসিয়াছে।

রাজকুমারের সঙ্গে এত বড়ো (বারো তেরো কম বয়স নয় গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের) মেয়েকে পাঠানো সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিয়া মনোরমা আগেই মাসির কাছে পত্র দিয়াছিল, তবু কালীর মা মেয়েকে একা ছাড়িয়া দিতে সাহস পায় নাই। কালীর সঙ্গে তার সাত বছরের একটি ভাইও আসিয়াছে।

কালী বলে, কী দিদি?

মনোরমা বলে, বললাম যে? শুকনো কাপড় নিয়ে আয় রাজুদার ঘর থেকে।

মনোরমার উদারতায় মনে মনে রাজকুমারের হাসি পায়। শ্যামলের জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে আহা, অসুখ যদি করে ছেলেটার? ভাবিয়া বড়ো ব্যাকুল হইয়াছে কিনা মনোরমা, তাই, হাতের কাছে আলনাতে স্বামীর শুকনো কাপড় আলনাতেই থাক, রাজকুমারের ঘর হইতে কাপড় আনা হোক একখানা কালীকে দিয়া। এত হিসাব করিয়া অবশ্য মনোরমা কথাটা বলে নাই। তার মনেও আসে নাই এ মানে। এটা শুধু অভ্যাস।

থাক, আমার ঘরে গিয়েই কাপড় ছাড়বেখন।

বলিয়া শ্যামলকে নিয়া রাজকুমার ঘরে চলিয়া যায়। কালী মুচকি মুচকি হাসিতেছে দেখিয়া মনোরমা রাগের সুরে বলে, হাসছিস যে?

কালী তেমনইভাবে হাসিতে হাসিতেই বলে, তুমি যেন কী দিদি! বলিয়া এক দৌড় দেয় ঘরের মধ্যে, সেখানে তার মুচকি হাসি শব্দময় হইয়া উঠে।

ঘরে একটিমাত্র চেয়ার, একটির বেশিকে স্থান দেওয়াও মুশকিল। শ্যামল সেই

চেয়ারে বসে, রাজকুমার পা ঝুলাইয়া বসে তার খাটের বিছানায়।

এখন তার মনে হইতে থাকে, রাস্তায় সংক্ষেপে কথা সারিয়া শ্যামলকে বিদায় দিলেই ভালো হইত। শ্যামলকে ও ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ অতখানি মমতা ও সহানুভূতি বোধ করিয়াছিল কেন কে জানে! মনে হইয়াছিল, ধীর স্থির শান্তভাবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ওর মানসিক বিপ্লব যতটুকু পারা যায় শান্ত করার চেষ্টা করা তার কর্তব্য। মর্মাহত ছোটো ভাইটির মতো ছেলেটাকে কাছে টানিয়া সান্ত্বনা না দিলে অন্যায় হইবে। কারণ তার বয়স বেশি, অভিজ্ঞতা বেশি, জ্ঞান বেশি, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বেশি।

এমন খারাপ লাগিতেছে এখন! উপদেশ দিয়া এই বয়সের দুরন্ত হৃদয়াবেগ সম্পন্ন ছেলেমানুষটিকে শান্ত করা! সে তো পাগলামির শামিল।

এবার বলো শ্যামল, কী বলতে চাও।

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া শ্যামল অন্যদিকে তাকায়, হঠাৎ কিছু বলিতে পারে না। এ তো জানা কথাই যে মনের মধ্যে তার ঝড় চলিতেছে, কথা আরম্ভ করা তার পক্ষে সহজ নয়। বাড়ির সামনে রাস্তায় প্রথম ঝোঁকে হয়তো অনেক কথাই সে বলিয়া ফেলিতে পারিত, এতক্ষণের ভূমিকার পর খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আপনি ওকে বিয়ে করবেন?

শ্যামলের কথা শুনিয়া রাজকুমার কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না। এই রকম প্রশ্নই সে প্রত্যাশা করিতেছিল।

এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

আপনি তা বুঝতে পারছেন।

না, বুঝতে পারছি না। তুমি মালতীর অভিভাবক নও, আত্মীয়ও নও। আমাকে এ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই।

আমার অধিকার আছে।

শ্যামল এমন জোরের সঙ্গে কথাটা ঘোষণা করিল যে কথাটার সহজ মানে বুঝিতে রাজকুমারের একটু সময় লাগিল। মনে হইল সত্যসত্যই মালতী সম্পর্কে অন্য অধিকারও বুঝি শ্যামলের আছে।

কীসের অধিকার তোমার? তুমি নিজে মালতীকে বিয়ে করতে চাও, এই অধিকার?

শ্যামলের মেরুদণ্ড সিধা হইয়া গেল। সোজা রাজকুমারের চোখের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট উচ্চারণে প্রত্যেকটি কথায় জোর দিয়া দিয়া সে বলিল, বিয়ে করি বা না করি, ওকে আমি স্নেহ করি। আপনাদের ও সব কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না, সোজাসুজি এই বুঝি যে মালতীর এতটুকু ক্ষতি হলে আমার সহ্য হবে না। সেই দাবিতে আমি আপনাকে স্পষ্ট একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি, সোজা ভাষায় জবাব দিন।

তুমি বড়ো ছেলেমানুষ শ্যামল।

বাজে কথা বলে লাভ কী?

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল।

শ্যামল খালি গায়ে বসিয়া আছে, রাজকুমারের শুকনো কাপড়খানা শুধু সে পরিয়াছে, জামা গায়ে দেয় নাই। প্রয়োজনের বেশি সামান্য একটু ভদ্রতাও সে যেন রাজকুমারের কাছে গ্রহণ করিতে চায় না। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন তার দেহের, বোধ হয় অল্পদিন আগে ব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে, পেশিগুলি স্পষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে কিন্তু এখনও কঠিন হয় নাই। প্রথম হইতেই রাজকুমার কেমন মৃদু একটু ঈর্ষা বোধ করিতেছিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সুগঠিত মাংসপেশির জন্য একজন তরুণকে সে হিংসা করিবে? এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হইতে পারে। কিন্তু ছেলেটার তেজ দেখিয়া রাগে ভিতরটা জ্বালা করিতেছে জানিয়া, গলা ধাক্কা দিয়া ছেলেটাকে বাড়ির বাহির করিয়া দিবার ইচ্ছা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হইতেছে বলিয়া, ঈর্ষার অস্তিত্বটা আর নিজের কাছে অস্বীকার করা গেল না।

একটু আগে যার উপর গভীর মমতা জাগিয়াছিল, এখন তাকে আঘাত করিতে ইচ্ছা হইতেছে, মালতীর প্রতি তার প্রথম যৌবনের ভাবপ্রবণ অন্ধ ভালোবাসার সুযোগ নিয়া হীন কাপুরুষের মতো অকারণ নিষ্ঠুর আঘাত করিবার সাধ জাগিতেছে।

শ্যামল বলিল, বলুন? জবাব দিন?

তুমি যাও শ্যামল।

আমার কথাটার জবাব দিন আগে? আপনার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিন, আমি এক সেকেন্ডও আপনাকে জ্বালাতন করব না।

মুখখানা শ্যামলের কালো হইয়া গিয়াছিল, রাজকুমারের সাড়াশব্দ না পাইয়া হাতের উলটা পিঠ দিয়া সজোরে সে একবার কপালটা মুছিয়া ফেলিল। কপাল তার ঘামিয়া উঠিয়াছে।

বুঝতে আমি পারছি, উদ্দেশ্য ভালো হলে এত ইতস্তত করতেন না। তবু আপনার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই।

শুনে কী করবে?

প্রশ্নটা যেন বুঝিতেই পারিল না, এমনই ভাবে শ্যামল খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, কী করব? তা জানি না। আপনি তো জানেন আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

তুমি শুধু জানতে চাও?

এক মুহূর্তে রাজকুমার যেন নিজেকে ফিরিয়া পাইল। কী ছেলেমানুষিই এতক্ষণ সে করিয়াছে এই ছেলেমানুষের সঙ্গে। জীবনের কেনা-বেচার হাটে যাকে শুধু খেলনা দিয়া ভুলানো যায়, তার সঙ্গে এত সাবধানতার সঙ্গে শুরু করিয়াছে সুখ দুঃখ হাসি কান্নার পণ্য নিয়া বুঝাপড়ার তর্ক।

রাজকুমার একটা সিগারেট ধরাইল, কথা কহিল ধীরে ধীরে, অন্তরঙ্গ ভাবে, বন্ধুর মতো।

তোমাকে একটা কথা বলি শ্যামল। মালতীকে তুমি ভালোবাসো। তোমার এ ভালোবাসা দুদিনের নয় নিশ্চয়? বিয়ে না হলেও চিরদিন তুমি মালতীকে ভালোবেসে যাবে নিশ্চয়?

কিন্তু—

কিন্তু জানি। তুমি বলতে চাও, তোমার কথা আলাদা। মালতীর জীবনে এতটুকু দুঃখ আনার চেয়ে মরে যাওয়া তুমি ভালো মনে কর। কারণ, তুমি যে ভালোবাসো মালতীকে। টোকা দিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া গলার সুর বদলাইয়া,—কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি না, তাই আমার সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনার সীমা নেই। তোমার মতে, ভালোবাসাটা তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি, এ জগতে আর কেউ ভালোবাসতে পারে না, আর কারও ভালোবাসার অধিকার নেই।

অন্তত আপনার নেই।

শুনিয়া আহত বিস্ময়ে রাজকুমারের মুখে কথা ফুটিল না।

শ্যামল একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিল, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, সে শ্রদ্ধা বজায় থাকলে মালতীর সম্বন্ধে আমার এতটুকু ভাবনা হত না। কিন্তু আপনি নিজেই আমার শ্রদ্ধা ভেঙে দিয়েছেন।

সেদিন সভায় তোমায় অপদস্থ করেছিলাম বলে?

না। গিরির সঙ্গে কুৎসিত ব্যবহার করেছিলেন বলে।

তারপর শ্যামল চলিয়া যাওয়ার আগে আরও যে দু-চারটি কথা বলিল, রাজকুমারের কানে গেল না। যেমন বসিয়াছিল তেমনইভাবে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন অকথ্য গালাগালি দিয়াই তবে গিরীন্দ্রনন্দিনীর জননী তাকে রেহাই দেয় নাই, প্রায়শ্চিত্তের জেরটা যাতে আরও টানিয়া চলিতে হয় তার ব্যবস্থাও করিয়াছে।

গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে তার কুৎসিত ব্যবহারের সংবাদ আরও কত লোকে জানিয়াছে কে জানে!

জীবনে এই প্রথম মিথ্যা দুর্নামের সংস্পর্শে আসিয়া রাজকুমারের মন যেন দিশেহারা হইয়া গেল। কতবার ভাবিল যে, লোকে যা খুশি ভাবুক, তার কী আসিয়া যায়, সে তো কোনো অন্যায় করে নাই। সে কেন জ্বালাবোধ করিবে তার সম্বন্ধে কে কোথায় কী মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতেছে ভাবিয়া? কিন্তু জ্বালা সে বোধ করিতেই লাগিল। অন্যায় না করুক, সেদিন ভুল সে করিয়াছিল, বোকামি করিয়াছিল। ভুলের শাস্তিও মানুষকে পাইতে হয় বইকী। গরম চায়ে পর্যন্ত মুখ পুড়িয়া যায়।

এ দুর্নামের প্রতিবাদে তার কিছু বলিবার উপায় পর্যন্ত নাই। শ্যামলকে সমস্ত ব্যাপারটি খুলিয়া বলিলেও সে বুঝিত না, বিশ্বাসও করিত না। শ্যামলের মতো অন্য

সকলেও বুঝিবে না, বিশ্বাস করিবে না। নীরবে এ অপবাদ তাকে মানিয়া নিতে হইবে।

এমনই যখন মানসিক অবস্থা রাজকুমারের, অবরুদ্ধ নিরুপায় ক্রোধের উত্তেজনায় ভিতরটা যখন তার ফেনার মতো ফাটিয়া যাইতে চাহিতেছে আর সমস্ত জগতের উপর ভয়ঙ্কর একটা প্রতিশোধ নেওয়ার অন্ধ কামনা জাগিয়াছে, তখনকার মতো জগৎকে পাওয়া না গেলেও হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকেই আঘাত করার জন্য ছটফট করিতেছে, ঘরে তখন আসিল কালী।

বলিল, দিদি ডাকছে, খেতে চলুন।

গিরির সমবয়সী কালী। গিরির মতো সেও সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে বর্বরতার আবহাওয়ায় মেছুনি মায়ের কোলে মানুষ হইয়াছে। গিরিকে নিয়া একটা বদনাম যখন তার রটিয়াছে, কালীকে নিয়া আর একটা বদনামও রটুক। রটুক, কী আসিয়া যায়? মনটা শান্ত হওয়ার সময় পাইলে নিজের খাপছাড়া খেয়ালে নিজেরই তার হাসি পাইত। এখন মনে হইল, খেয়ালটা না মিটাইতে পারিলে কোনোমতেই তার চলিবে না।

কালী, শোনো।

কালী নির্ভয়ে কাছে আগাইয়া আসিল।—কী?

তোমার নাড়ি আছে কালী? অসুখ হলে ডাক্তাররা হাত ধরে যে পালস দ্যাখে, সেই নাড়ি।

আছে না? ও পালস সবারই থাকে।

কালীর মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তোমার পালস নেই। এক একটি মেয়ের থাকে না।

পালস না থাকলে কেউ বাঁচে? মরে গেলে তখন পালস থাকে না। এই দেখুন—কালী ডান হাতটি বাড়াইয়া দিল।

কবজি ধরিয়া নাড়ি পরীক্ষার সুবিধা দেওয়ার জন্য ঘেঁষিয়া আসিল আরও কাছে।

তখন খেয়াল করে নাই, কিন্তু মনের মধ্যে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তির সময় রাজকুমারের মনে পড়িয়াছে, হাত ধরা মাত্র গিরীন্দ্রনন্দিনী কেমন যেন শক্ত হইয়া গিয়াছিল। কালীর কৌতুকের হাসি আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত ভাব রাজকুমারের মনে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিল। এ রকম হওয়ার তো কথা নয়।

ইস! তোমার পালস তো ভারী দুর্বল কালী?

কালীর হাসি মিলাইয়া গেল।

সত্যি?

তোমার হার্ট নিশ্চয় ভারী দুর্বল।

আমি তো জানি না।

দেখি তোমার হার্ট— ?

গিরির হৃৎস্পন্দন শুধু সে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিল, কালীর হৃৎস্পন্দন সে পরীক্ষা

করিতে গেল এক হাতে তাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়া যাইতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ কালী নিষ্পন্দ হইয়া রহিল, তারপর রাজকুমারের হাত সরাইয়া দিয়া নিজেও একটু তফাতে সরিয়া গেল। সেখানে দাঁড়াইয়া শঙ্কিত প্রশ্ন আর মৃদু ভয় ও ভর্ৎসনা দু চোখে ফুটাইয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। এক মুহূর্ত পরে ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাজকুমার ভাবিল, এবার মনোরমা আসিবে। আসিয়া অকথ্য গালাগালি শুরু করিয়া দিবে।

মনোরমা আসিল। অনুযোগও দিল।

খাবে না রাজুভাই?

হ্যাঁ, যাই।

কালী নিশ্চয় মনোরমাকে কিছু বলে নাই। কালী ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া-যাওয়ার যতটুকু সময়ের মধ্যে মনোরমা তাকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছে তার মধ্যে এত বড়ো একটা গুরুতর কথা কালীর বলা ও মনোরমার শোনা সম্ভব নয়। গিরির মতো এক নিশ্বাসে সমস্ত বিবরণ হয়তো কালী জানাইতে পারিবে না। ব্যাপারটার একটু আভাস দিয়াই তার মুখে আর কথা ফুটিবে না। মনোরমাকে তখন খুঁটিয়া খুঁটিয়া জেরা করিয়া সব জানিতে হইবে। তাতে কিছু সময় লাগিবার কথা। মনোরমার গালাগালিটা তবে ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল?

খাইতে বসিয়া রাজকুমার ঘাড় হেঁট করিয়া খাইয়া যায়। কাল মনোরমার হুকুমে কালী পরিবেশন করিয়াছিল। মনোরমা কি আজও তাকে ডাকিবে? ডাকিলে কালী যদি না আসে? ব্যাপার বুঝিতে গিয়া মনোরমা যদি সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝিয়া আসে? কী বিপদেই মনোরমা পড়িবে তখন! একটা মানুষকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে, তার খাওয়াও নষ্ট করিতে পারিবে না, মনের রাগ চাপিয়াও রাখিতে পারিবে না।

কালীকে তোমার কেমন লাগে রাজুভাই?

মুখের ভাতটা গিলিতে রাজকুমারকে তিনবার চেষ্টা করিতে হইল।

ভালোই লাগে।

বড়ো লাজুক হয়েছে মেয়েটা। কিছুতে তোমার সামনে আসতে চায় না। তা বড়োসড়ো হয়ে উঠছে, একটু লজ্জা হবে বইকী। চোদ্দো পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে।

কালীর বয়সটা রাজকুমার জানিত, তার সাদাসিদে মাটি রাজকুমারের কাছে বলিয়া ফেলিয়াছিল। কালীর বয়সটা মনোরমা একেবারে দুবছর বাড়াইয়া দিতে চায় কেন প্রথমটা রাজকুমার বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তারপর একটা অবিশ্বাস্য কথা মনে আসায় অবাক হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তোমার নামে কালী কিন্তু আমার কাছে একটা নালিশ করেছে রাজুভাই।

মনোরমার মুখে কৌতুকের হাসি। চোখ দিয়া তার হাসি দেখিতে দেখিতে কান

দিয়া তার কথা শুনিয়া রাজকুমারের যেন কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধা লাগিয়া গেল। কালী তবে নালিশ করিয়াছে? কালীর নালিশ শুনিয়া মনোরমা তাকে অনুযোগ দিতেছে সকৌতুকে!

তুমি নাকি ওকে মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিলে? বিকেলে আমায় বলছিল, তুমি নাকি ভারী খারাপ লোক, কথা দিয়ে কথা রাখো না। আমি বললাম, যা না, বলগে না তুই তোর রাজুদাকে? তা মেয়ে বলে কী, লজ্জা করে দিদি।

জলের গেলাস তুলিয়া রাজকুমার গেলাসের অর্ধেকটা খালি করিয়া ফেলিল। খাওয়ার পর অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসিয়া রাজকুমার সিগারেট টানিতেছে, দরজার কাছে বিছানো বারান্দার বালবের আলোয় একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। ছায়া আর নড়ে না। মনোরমার ছায়া নিশ্চয় নয়। ছায়া ফেলিয়া কারও ঘরের বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকার ধৈর্য মনোরমার নাই।

রাজুদা?

রাজকুমার সাড়া দিতেই কালী ঘরে আসিল।

মশলা নিন।

প্রতিফলিত আবছা আলোয় হাত বাড়ানো দেখা যায়। রাজকুমারের হাতের তালুতে মনোরমার সযত্নে প্রস্তুত মশলা দিয়া কালী বলিল, আঁধার দেখে এমন ভয় করছিল। জানি আপনি আছেন, তবু ভাবছিলাম, যদি না থাকেন? আঁধারে আমি বড্ড ডরাই।

আলোটা জ্বালো।

জ্বালবো?

কালী বোকা নয়, কিছু শুধু জানে না। ইঙ্গিত ও সংকেতের ভাষা এখনও শেখে নাই। মালতী সরসী বা রিণি যদি ছুটিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া এ ভাবে ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, জ্বালবো?—একটি শব্দে কী মহাকাব্যই সৃষ্টি হইয়া যাইত। কালী শুধু প্রশ্নের ভঙ্গিতে তার কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে।

আলো জ্বালিয়া কালী চলিয়া গেলে রাজকুমার ভাবে, অভিধান নিরর্থক। শব্দের মানে তারাই ঠিক করে, যে বলে আর যে শোনে কাজ ও উদ্দেশ্যের বেলাতেও তাই। কী ব্যাপক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

বর্ষা শেষ হইয়াছে।

মাঝে মাঝে বাতাসে হঠাৎ যে শীতের আমেজ পাওয়া যায় এখনও তা ভিজা ভিজা মনে হয়, কান্নার শেষে তোয়ালে দিয়া মুছিয়া নেওয়ার পর মালতীর গালের শীতল স্পর্শের মতো। কালী মার কাছে চলিয়া গিয়াছিল, কয়েকদিনের জন্য আবার আসিয়াছে। মনোরমার তাড়া নাই, বিফল হওয়ার ভয়ও যেন নাই। কালীর দেহে যৌবনের বিকাশে যেমন এতটুকু ব্যস্ততা দেখা যায় না অথচ বিকাশ তার অনিবার্য গতিতে ঘটিতেই থাকে, মনোরমার

অভিযানও তেমনই ধীর স্থির মন্থর গতিতে গড়িয়া উঠে। খেলার ছলে হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করার বিরুদ্ধে কালীর প্রতিবাদ যেমন রাজকুমারের অজ্ঞাতসারেই তিলেতিলে হুকুম হইয়া মাথা তুলিতে আরম্ভ করে, তাকে ঘিরিয়া মনোরমার জাল বোনাও তেমনই হইয়া থাকে তার অদৃশ্য।

কালীকে মনোরমা কখনও বেশি সাজায় না, তার ঘরোয়া সাধারণ সাজেই বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। কালীর একরাশি কালো চুল আছে, কোনোদিন মনোরমা লম্বা বিনুনি ঝুলাইয়া দেয়, কোনোদিন রচনা করে ফুলানো ফাঁপানো খোঁপা। সকালে ঘরের কাজ করার সময় কালীর গায়ে সাদাসিধে ভাবে জড়ানো থাকে নিমন্ত্রণে যাওয়ার জমকালো দামি শাড়ি, বিকালে সযত্ন প্রসাধনের পর তাকে পরিতে হয় সাধারণ মিলের কাপড়।

সকালে কালী কাতর হইয়া বলে, ভালো কাপড়খানা নষ্ট হয়ে যাবে যে দিদি?

মনোরমা বলে, হোক। আঁচলটা জড়া দিকি কোমরে, ঘর দোর ঝাঁট দে রাজুর। খাটের তলাটা ঝাঁটাস ভালো করে।

বিকালে আরও বেশি কাতর হইয়া কালী বলে, এটা নয় দিদি, পায়ে পড়ি তোমার, ওটা পরি এখন, আবার খুলে রাখব একটু পরে?

মনোরমা বলে, না, অত ফ্যাশন করে কাজ নেই তোমার। গরিবের মেয়ে গরিবের মতো থাকো।

কাছে টানিয়া আদর করিয়া বলে, বোকা মেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে তোকে যে বেশি সুন্দর দেখায় রে!

রাজকুমারের কাছে, সে আপশোশ করে, বড়ো চপল মেয়েটা রাজু, বড়ো চঞ্চল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, তাও বলি, মেয়ে যেন মানুষের মন কাড়তে জন্মেছে। কী দিয়ে এমন মায়া জাগায় ছুঁড়ি ভগবান জানেন। ডাইনি এসে জন্মায়নি তো মানুষের পেটে? কদিনের জন্যে তো এসেছে, সেখানে পাড়াসুদ্ধ সবাই অস্থির, রোজ সবাই জিজ্ঞেস করে, কালী কবে ফিরবে গো কালীর মা? যদুবাবু মস্ত বড়োলোক ওখানকার, বংশ একটু নিচু, তার গিন্নি মাসিকে এখন থেকে সাধাসাধি করছে, ছেলে বিলেত থেকে ফিরলে কালীকে আমায় দিও কালীর মা।

তবে তো কালীর বিয়ের জন্য কোনো ভাবনাই নেই।

কে ভাবে ওর বিয়ের জন্য?

মনোরমার কাছে এ সব শোনে আর কালীকে রাজকুমার একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করে। তার মনে হয়, কেবল কথাবার্তা চাল চলন শিক্ষা দীক্ষার দিক হইতে নয়, কালীর গড়নটি পর্যন্ত যেন ঘরোয়া ছাঁচের, বহুকাল আগে মিসেস বেলনসের আঁকা গত শতাব্দীর বাঙালি নারীর ছবির আদর্শে কালীর দেহ গড়িয়া উঠিতেছে।

এ রকম মনে হয় কেন? সাজ-পোশাকের এমন কোনো নতুনত্ব তো কালীর নাই যে জন্য এ রকম একটা ধারণা জন্মিতে পারে। সাধারণ বাঙালি সংসারের আর দশটি

মেয়ের মতোই তার সাধারণ বেশভূষা। অন্য কোনো মেয়েকে দেখিয়া তো আজ পর্যন্ত তার মনে হয় নাই, দেয়াল আর ঘোমটার আড়ালে শুধু একজনের দৃষ্টিকে বিহ্বল করার জন্য তার রূপযৌবন, দেহটি শুধু তার সেবা আর গৃহকর্মের উপযোগী?

রিণি, সরসী আর মালতীর সঙ্গে, আত্মীয় এবং বন্ধু পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, কালীকে মিলাইয়া দেখিয়া রাজকুমার রহস্যভেদের চেষ্টা করে। ট্রামে বাসে ঘোমটা টানা ঘোমটা খোলা বউ আর স্কুল কলেজের মেয়ে উঠিলে তাদের সঙ্গেও মনে মনে কালীকে মিলাইয়া দেখিতে তার ইচ্ছা হয়।

নিজের এক অলস কল্পনার ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে গিয়া এমন এক বিস্ময়কর সত্য প্রথম আবিষ্কারের অস্পষ্টতায় আবৃত হইয়া তার মনে উঁকি দিতে থাকে যে রাজকুমার অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটা আরও ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য তার উৎসাহ বাড়িয়া যায়। তার এই খাপছাড়া গবেষণার যে একটি অতি বিপজ্জনক দিক আছে এটা তার খেয়ালও থাকে না।

যে রাজকুমারকে এতকাল দেখা পাওয়াই কঠিন ছিল হঠাৎ তার ঘনঘন আবির্ভাব ঘটিতে থাকায় এবং তার শান্ত নির্বিকার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ির মেয়েদের চমক লাগিয়া যায়। রাজকুমারের ব্যগ্র উৎসুক চাহনি সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছে দেখিয়া কেউ দারুণ অস্বস্তি বোধ করে, কেউ মনে মনে রাগিয়া যায়, কেউ অনুভব করে রোমাঞ্চ। প্রত্যেকে তারা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবিতে থাকে, এতকাল পরে আমার মধ্যে হঠাৎ কী দেখল যে এমন করে তাকিয়ে থাকে? কেউ তার সামনে আসাই বন্ধ করিয়া দেয়, কেউ কথা ও ব্যবহারে কঠিনতা আনিয়া দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করে, কেউ আরও কাছে সরিয়া আসিতে চায়।

রিণি, সরসী আর মালতী রাজকুমারের এই অদ্ভুত আচরণ তিনভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে তিন জনেই, অস্বস্তি বোধ করিয়াছে প্রায় একই রকম, কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টায় তাদের মনে এমন ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উদয় হইয়াছে যে জানিতে পারিলে মানুষের মন সম্বন্ধেও একটা নূতন জ্ঞান খুব সহজেই রাজকুমারের জন্মিয়া যাইত।

রিণি ভাবে : এতদিনে কি বুঝিতে পারা গেল সেদিন গান প্র্যাকটিস করার সময় সে অমন আগ্রহের সঙ্গে মুখ বাড়াইয়া দিলে রাজকুমার তাকে কেন অপমান করিয়াছিল? রাজকুমারের মন কবিত্বময়, বাস্তব জগতের অনেক উঁচুতে নিজের মানস-কল্পনার জগতে সে বাস করে; বড়ো ভাবপ্রবণ প্রকৃতি রাজকুমারের। তার মনের ঐশ্বর্য রাজকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছে, তার হাসি কথা গান ভাবালোকের অপার্থিব আনন্দ দিয়াছে রাজকুমারকে, তার সান্নিধ্য অনুভব করিয়াই, রাজকুমারের মন এমনভাবে অভিভূত হইয়া গিয়াছে যে একটি চুম্বনের প্রয়োজনও সে বোধ করে নাই। সেদিন রাজকুমার তাই চমকাইয়া গিয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পায় নাই। গান শুনিতে শুনিতে যে মানুষটা স্বপ্ন দেখিতেছিল হঠাৎ সচেতন

হওয়ার পর তার খাপছাড়া ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া সেদিন তার রাগ করা উচিত হয় নাই। হয়তো সেদিন রাজকুমারের প্রথম খেয়াল হইয়াছিল, সে শুধু মন আর হাসি গান কথা নয়, একটা শরীরও তার আছে। হঠাৎ যে রাজকুমার এমন অসভ্যের মতো খুঁটিয়া খুঁটিয়া তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এটা হয়তো তার এই নূতন চেতনার প্রতিক্রিয়া। তার অপূর্ব রূপ প্রথম দেখিতে আরম্ভ করিয়া রাজকুমারের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে।

সরসী ভাবে : এতদিন তার শরীরটাই ছিল রাজকুমারের কাছে বড়ো। তার দিকে তাকাইলে মানুষ সহজে চোখ ফিরাইতে পারে না, তার এই দেহের বিস্ময়কর রূপ মানুষের মধ্যে দুরন্ত কামনা জাগাইয়া দেয়। এতকাল রাজকুমার তার শরীরটা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে, তাই লজ্জা সংকোচে তার দিকে ভালো করিয়া তাকাইতে পারে নাই। তারপর রাজকুমার বুঝি তার অন্তরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের মন-ভুলানো মেয়েলি হাবভাবের সস্তা অভিনয় সে যে কখনও করে না, লজ্জাবতী লতা সাজিয়া থাকে না, নাকি সুরে কথা বলে না, ভাবপ্রবণতা পছন্দ করে না, বাজে খেয়ালে হালকা খেলায় সময় নষ্ট করে না, এ সব বোধ হয় রাজকুমারের খেয়াল হইয়াছে। খুব সম্ভব সেদিনের সভায় রাজকুমার তার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তার ভিতরের জন্য রাজকুমার তাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে। ভালোবাসে বলিয়া এখন আর রাজকুমার তার দিকে চাহিতে সংকোচ বোধ করে না, মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়।

মালতী ভাবে : ছি ছি, রাজকুমার কেমন মানুষ? সে তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই রাজকুমারের এমন পরিচয়ও তাকে পাইতে হইবে! সে ভালোবাসে জানা গিয়াছে কিনা, তাই রাজকুমার এখন তাকে যাচাই করিতেছে। তাকে নয়, তার দেহকে। কোথায় তার কোন খুঁত আছে রূপের খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাই এখন বাহির করিতেছে রাজকুমার। ভালোবাসার দৃষ্টিতে যদি এমন মনোযোগের সঙ্গে রাজকুমার তাকে দেখিত। কিন্তু চোখে তার ভালোবাসা নাই। মনে মনে কী যেন সে হিসাব করিতেছে যার যাচাই করার দৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইতেছে।

কালীও অনেক কথা ভাবে। কিছু সে বুঝিতে পারে না, তার ভয় হয়, লজ্জায় সে আড়ষ্ট হইয়া যায়। আপনা হইতে কখনও যে ডাকিত না, হঠাৎ এতবার সে কেন অকারণে কাছে ডাকে? সামনে দাঁড় করাইয়া কেন বলে, এদিকে মুখ করো, এদিকে মুখ করো, পিছনে ফিরে দাঁড়াও?

মনোরমাও রাজকুমারের ভাবান্তরে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। এমন বোকা সে নয় যে মনে করিবে কালীকে হঠাৎ বড়ো বেশি পছন্দ হইয়া যাওয়ায় সর্বদা তাকে কাছে ডাকিয়া রাজকুমার তার সঙ্গে ভাব করিতে চায়। পছন্দ হইয়া থাকিলে আর ভাব করার ইচ্ছা জাগিয়া থাকিলে এভাবে যখন তখন বিনা কারণে ডাকার বদলে সে বরং বিশেষ দরকার হইলেও কালীকে ডাকিত না। রাজকুমারকে অন্য সকলে যতটা চেনে মনোরমা তার চেয়ে

অনেক বেশিই চিনিয়াছে। গিরীন্দ্রনন্দিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহারই রাজকুমার করিয়া থাক, যদি ধরিয়াও নেওয়া যায় যে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে অন্যায় ব্যবহারই করিয়াছিল, গিরির টানেই সে যে সেদিন তাদের বাড়ি গিয়াছিল, মনোরমা তা বিশ্বাস করে না। গিরির জন্য যাইতে ইচ্ছা হইলে সে কখনও সে বাড়ির চৌকাট মাড়াইত না।

মনোরমা ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছিল না, রাজকুমার তার সমস্ত ভাবনা মিটাইয়া দিল। সকাল বেলা রাজকুমার তাকে বলিল, কালীকে রিণিদের বাড়ি একটু নিয়ে যাচ্ছি দিদি।

ওমা কেন?

শুধু ঘরে বসে থাকবে? দু-চারজনের সঙ্গে একটু ভাবসাব করে আসুক?

মনোরমার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

বেশ তো নিয়ে যাও, আমায় আবার জিজ্ঞেস করা কেন?

কালীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে বহিয়া নিয়া গিয়া রিণি, সরসী, মালতী আর অন্য মেয়েদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে রাজকুমারের বড়ো অসুবিধা হইতেছিল। ও রকম আন্দাজি গবেষণার এত বড়ো একটা তথ্য কি যাচাই করা চলে? পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কালীর সঙ্গে অন্য মেয়ের দেহের গড়নের তুলনা না করিলে অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না।

কালীকে সঙ্গে করিয়া সে দুবেলা বাহির হয়, এক একজনের বাড়ি গিয়া কালীর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেয়। সকলে তারা ভাবে, এ আবার কী খেয়াল রাজকুমারের? মনোরমা খুব খুশি হয়। এতদিন তার শুধু আশা ছিল, এবার তার ভরসা জাগে যে আশা হয়তো তার মিটবে।

ধীরে ধীরে রাজকুমারের কাছে তার অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অনুমান স্পষ্ট প্রমাণিত সত্য হইয়া উঠিতে থাকে। দ্বিধা সন্দেহ মিলাইয়া যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হইতেছিল, মাথাটা বুঝি তার খারাপ হইয়া গিয়াছে, পাগলের মতো সে অনুসরণ করিতেছে নিজের বিকৃত চিন্তার। এই আত্মগ্লানির বদলে এখন সে অনুভব করিতে তাকে আবিষ্কারকের গর্ব।

কালীকে দেখিয়া তার মনে হইয়াছিল, তার দেহের গড়ন ঘরোয়া, অন্তঃপুরের একটি বিশেষ আবেষ্টনীতে একটি বিশেষ জীবনের সে উপযোগী। এখন সে জানিতে পারিয়াছে কেবল কালী একা নয়, সকলের দেহের গড়নেই এই সংকেত আছে, দেহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় সমাজের নানা স্তরে জীবনের বহু ও বিচিত্র পরিবেশের কোনটিতে সে খাপ খাইবে।

শুধু মন নয়, দেহের গঠন দেখিয়াও বিচার করিতে হয় কোন জীবন কার পক্ষে স্বাভাবিক, কোন জীবনে কার বিকাশ বাধা পাইবে না।

দেহ? এতকাল রিণি, সরসী আর মালতীর মনের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল, আজ তাদের দেহ কী বিস্ময়কর সংবাদই তাকে জানাইয়াছে। শুধু মনের হিসাব ধরিয়া সংসারে

নিজেদের স্থান বাছিয়া নিতে গেলে জীবন ওদের ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অসংখ্য নারী ও পুরুষের যেমন গিয়াছে।

একদিন সরসীকে রাজকুমার বলিল, রিণি আর মালতীকে নেমন্তন্ন কর না?

কেন?

এমনি। তোমাদের একটা গ্রুপ ফটো নেব।

কবে?

কাল সকালে।

হঠাৎ আমাদের ফটো নেবার শখ হল কেন?

শখের কি কেন থাকে সরসী?

এ সব শখের কথা থাকে। আচ্ছা বলব। কিন্তু সকালে কেন, বিকেলে বললে হবে না?

তাই বোলো। তিনটে চারটের মধ্যে যেন আসে।

রাজকুমার একটু ভাবিল, খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, আচ্ছা , জ্যোৎস্না মমতা এদের বললে হয় না? আর তোমার সেই রুক্মিণীকে?

ওদেরও ফটো নেবে নাকি?

দোষ কী?

সরসী হাসিল, না দোষ কিছু নেই। হঠাৎ এতগুলি মেয়েকে একত্র করে ফটো নিতে চাইলে একটু খাপছাড়া মনে হবে, আর কিছু নয়। সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু জ্যোৎস্না, মমতা আর রুক্মিণীকে নয় চিনলাম, ওদের কারা?

লিস্ট করে দিচ্ছি।

লিস্ট? প্রকাণ্ড গ্রুপ হবে বলো? এত সব অদ্ভুত শখ চাপে কেন তোমার? দুদিন যদি কিছু তুমি না করো, তিনদিনের দিন একটা কিছু করে অবাক করে দেবেই দেবে। এমনি চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় বয়স বুঝি সত্তর পেরিয়েছে, হঠাৎ যে তোমার কী হয় বুঝি না।

রাজকুমার সতেরোটি মেয়ের নাম লিখিয়া লিস্ট করিয়া দিলে সরসী ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, এতগুলি মেয়েকে বলতে হবে? কী ধরনের গ্রুপ হবে এটা? বান্ধবী গ্রুপ, না শুধু চেনা মেয়ের গ্রুপ? কুমারী গ্রুপ বলা চলবে না, তিনজনের বিয়ে হয়েছে।

কী যেন বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে চিন্তিতভাবে সরসী ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, রাজকুমারের চোখে মানে আবিষ্কার করিতে চায়।

ফটোর কথা মিছে। কী যেন মতলব আছে তোমার। আমায় বলো রাজু।

ওদের সকলকে একত্র করে দেখতে চাই।

কেন?

একটা ব্যাপার বুঝতে চাই। তুমি বুঝবে না, সরসী।

বুঝব না? তোমায় আমি সকলের চেয়ে ভালো বুঝি, তা জানো?

রাজকুমার একটু হাসিল। হাসিটা সরসীর পছন্দ হইতেছে না টের পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার গম্ভীর হইয়া গেল।

জানতাম না, কিন্তু মেনে নিচ্ছি। তবে এটা ঠিক আমার বোঝার কথা নয়। এ অন্য ব্যাপার। রাজেনবাবুকে ভালো বুঝলেও তার নতুন মেটিরিয়াল স্পিরিচুয়ালিজমের থিয়োরি কি বুঝতে পারবে ভরসা করো?

থিয়োরি না বুঝতে পারি, থিয়োরিটা কোন বিষয়ে সেটুকু বুঝতে পারব বইকী।

তবে শোনো। মেয়েদের দেহের গড়নের সঙ্গে মনের গড়নের সম্পর্কটা বুঝবার চেষ্টা করছি।

ও, তাই বলো।

অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সরসী যেন হঠাৎ আলো দেখিতে পাইয়াছে। চোখে তার উত্তেজনা দেখা দেয়, মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রাজকুমার বলিতে থাকে, আমার মতে দেহের গড়নের সঙ্গে মেয়েদের মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সরসী। সুস্থ স্বাভাবিক দেহের কথাই বলছি। যে আবেষ্টনীতেই একটি মেয়ে বড়ো হোক, তার দেহের গড়নের জন্য মনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকবেই। তোমার মানসিক ধর্মের কয়েকটা বিশেষ রূপ আছে, তুমি যদি জন্মের পরদিন থেকে অন্য একটি পরিবারে মানুষ হতে তবু এই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত। যেমন ধরো, তোমার সাহস। তোমার দেহের গড়ন না বদলিয়ে কোনো প্রভাব তোমার সাহস নষ্ট করতে পারত না। প্রকাশটা হয়তো অন্যরকমের হত। অন্য বাড়িতে অন্য অবস্থায় মানুষ হলে তুমি হয়তো পথকে ভয় করতে, পুরুষকে ভয় করতে, বেলগাছকে ভয় করতে, মার খেয়ে কাঁদতে ভয় করতে, তবু কতগুলি দিকে সাহস তোমার থাকতই। অসুখ বিসুখ বিপদ আপদে বাড়ির মধ্যে হয়তো একা তোমার মাথা ঠিক থাকত, হাতে শুধু শাঁখা পরে তুমিই হয়তো হাসিমুখে বড়োবাবুর দশ হাজার টাকার গয়না পরা বউয়ের সঙ্গে গল্প করতে, তুমিই হয়তো—

বুঝেছি, বুঝেছি। আর শুনতে চাই না রাজু, থামো। তুমি সত্যি বাঁচালে আমায়। তোমার থিয়োরি না পাগলামি সে তুমিই জানো, কদিন থেকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি এটুকু বুঝতে পারছি তাই আমার ঢের। এই জন্য তুমি অমন করে তাকাচ্ছিলে আমাদের দিকে, ট্রামে বাসে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা ছোঁড়াগুলোও যেমনভাবে তাকাতে পারে না? কী আশ্চর্য মানুষ তুমি রাজু!

রাজকুমারকে সরসী চা করিয়া দিল, তিনরকম খাবার দিল। কথা বলিতে লাগিল অনর্গল। তার হাসি কথা চলাফেরা সব যেন হঠাৎ হালকা হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে বলিতে সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তোমার ও থিয়োরি কি শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে খাটে? ছেলেদের বেলা খাটে না? শুধু মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা করার তোমার আগ্রহ কেন শুনি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া রাজকুমার বলল, ছেলেদের বেলাও খাটে। নিয়ম একই।

তবে পুরুষের দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতটা ঘনিষ্ঠ নয়। দেহের গড়ন অনুসারে মনের যে বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেটা একেবারে চাপা পড়ে যেতে পারে, থেকেও না থাকার শামিল হয়ে যায়। মেয়েদের ব্যাপার অন্যরকম।

তারা দেহসর্বস্ব বলে?

না, তাদের দেহ অন্যরকম বলে। দেহের অনুভূতি অন্যরকম বলে। দেহের উপযোগিতা অন্যরকম বলে। আরও অনেক কিছু আছে।

বিদায় দেওয়ার সময় সরসী বলিল, কাল তোমার লিস্টের সকলকে আসতে বলব, তুমি কিন্তু ওদের জানিও না শখটা তোমার। গ্রুপ ফটো তোলার শখ আমার, তোমায় দিয়ে আমি ফটো তোলাচ্ছি। বুঝতে পারছ?

পরদিন কালীকে সঙ্গে করিয়া রাজকুমার সরসীর বাড়ি গেল। তিনটি মেয়ে আসিতে পারে নাই। তবু চোদ্দোটি মেয়ে আসিয়াছে, কালী আর সরসীকে ধরিলে ষোলোজন। এতগুলি মেয়েকে একসঙ্গে পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াও রাজকুমার খুশি হইতে পারিল না। এতগুলি দেহ আর মনের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া দেখা রাজকুমারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। শুধু কথা বলিয়াই সময় কাটিয়া গেল।

জীবনে রাজকুমারের অনেকবার অনেকরকম ঝোঁক আসিয়াছে। এটা অবশ্য রাজকুমারের একচেটিয়া নয়, নেহাত গোবেচারি শ্লথ মানুষেরও ঝোঁক আসে। কোনো কোনো মানুষ ঝোঁকের মাথায় কখনও কোনো কাজ করে না, ভালো কাজও নয়। দুঃখ আর অশান্তি দূর করিয়া পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সুখী করার ঝোঁকও যদি এ সমস্ত মানুষের চাপে, যতক্ষণ ঝোঁক থাকিবে কিছুই তারা করিবে না। ঝিমাইয়া পড়া পর্যন্ত মনে মনে শুধু বিবেচনা করিয়া চলিবে কাজটা উচিত কি না আর লাভ লোকসানের খতিয়ানটা কী এবং নিজের সংযমের বাহুল্যে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে। সংযম যেন নিছক ধীরতা ও শৈথিল্য।

হঠাৎ-জাগা সমস্ত ইচ্ছাকে রাজকুমার অবশ্য আমল দেয় না, পাগল ছাড়া সেটা কারও পড়ে দেওয়া সম্ভবও নয়। তবে ঝোঁকের মাথায় কাজ করার স্বভাব তার আছে। অনেক পুরস্কার ও শাস্তি, আনন্দ ও বিষন্নতা এমনিভাবে অর্জন-করিয়াছে।

এবার যে সৃষ্টিছাড়া খেয়ালটি তাকে আশ্রয় করিল, আবির্ভাবটা তার আকস্মিক নয়। তবু এ খেয়ালটি ঝোঁকের মতোই প্রবল হইয়া উঠিল। প্রথমে মনের কোণে কথাটা একবার শুধু উঁকি দিয়া গেল। ভাঙা মেঘের মতো মনের আকাশের এক টুকরা অসঙ্গত আলগা চিন্তা। নিজের কাছেই যেন রাজকুমার লজ্জা বোধ করিল। এ সব চিন্তা কোথা হইতে ভাসিয়া আসে, আবার কোথায় চলিয়া যায়। এ চিন্তাটিরও ধীরে ধীরে মনের দিগন্তে মিলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তার বদলে দিন দিন যেন স্পষ্টতর ও অবাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীতের আমেজে দেহে সংকোচন প্রক্রিয়া অনুভব করা যায়, কালীর হাতে সেলাই করা পাড়ের কাঁথা গায়ে টানিয়া শেষ রাত্রে বড়োই আরাম বোধ হয়। আধো-ঘুম আধো-জাগরণের সেই যুক্তিহীন নীতিহীন নিষ্পাপ জগতের অবাস্তব অবলম্বনে একটি অপরূপ নিরাবরণ দেহ আলগোছে ভাসিতে থাকে। বেশি দূরে নয়, হাত বাড়াইলে বোধ হয় স্পর্শ করা যায়, তবু অস্পষ্ট। কোন জীবনের উপযোগী এ দেহ, ভিতরের প্রকৃতির কোন পরিচয় আঁকা আছে এই দেহের বাহিরে, কিছুই টের পাওয়া যায় না। ঘুম ভাঙিবার পর ছায়া মিলাইয়া যায়, ওই রকম কয়েকটি দেহ পরীক্ষা করিবার ঔৎসুক্য শুধু জাগিয়া থাকে রাজকুমারের।

মোটা মোটা ডাক্তারি বই আর নোটবুক গুলির পাতা উলটাইতে উলটাইতে এই কথাটা সে মনে মনে নাড়াচাড়া করে। পরীক্ষার জন্য দেহ ভাড়া করা যায়, কিন্তু সে-সব নবনারীর দেহ পরীক্ষা করিয়া তার বিশেষ কোনো লাভ হইবে না। যাদের সে জানে, যাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদের সঙ্গে জীবন যাপনের রীতিনীতির পরিচয় সে রাখে, নিরাবরণ তাদের কয়েকজনকে সে যদি দেখিতে পাইত!

কিন্তু এদের কারও কাছে ইচ্ছাটা জানানো পর্যন্ত চলে না।

শোনামাত্র যুগ-যুগান্তরের সংস্কারে ঘা লাগিবে, তাকে মনে করিবে পাগল, অসভ্য, বর্বর। বুঝাইয়া বলিলে যে কেউ বুঝিবে সে ভরসাও রাজকুমারের নাই।

সে যে শুধু একটা সত্যের, একটা নিয়মের সন্ধান চায়, কেউ তা বিশ্বাস করিবে না। যতই ভীরু আর লাজুক মনে হোক, উদ্ধত অত্যাচারী সৈনিক বা যন্ত্রীর জীবন ছাড়া শ্যামলের সুখী হওয়ার উপায় কেন নাই ; কঞ্চির মতো যতই অবাধ্য ও স্বাধীন মনে হোক রিণিকে, শাসন-পিপাসু শক্তিমান পুরুষের উপর বউয়ের মতো নির্ভর করিতে না পারিলে রিণির জীবনের সার্থকতা কেন নাই ; দেশে দেশে নগরে নগরে যাযাবর জীবন কেন স্যার কে এল-এর প্রয়োজন ছিল ; ইতিমধ্যেই চার-পাঁচটি সন্তানের মা হইতে না পারায় সরসী কেন সভাসমিতি করিয়া বেড়ায় ; এ সব প্রশ্নের জবাব জানিবার প্রয়োজন কেউ বোধ করে না, কৌতূহলও কারও নাই। এগুলি প্রশ্ন বলিয়াই তারা স্বীকার করিতে চায় কিনা সন্দেহ। মানুষের দেহে এইসব রহস্যের নির্দেশ সন্ধান করা ওদের কাছে অর্থহীন উদ্ভট ব্যাপার, ছি ছি করার ব্যাপার।

কিন্তু যেটুকু সে জানিয়াছে কেবল সেইটুকু জানিয়া থামিয়া থাকার কথা ভাবিলেও এদিকে জীবনটাই যেন অসঙ্গত মনে হয়। ঝোঁকের এই অভিশাপ চিরকালের —যখন যেদিকে গতি, সেদিক ছাড়া অন্য কোনোদিকে জগতের সার্থক অস্তিত্ব আছে ভাবা যায় না।

একদিন আলোচনা ও পরামর্শের জন্য রাজকুমার বিকালবেলা হাজির হয় বন্ধু পরেশের কাছে।

পরেশ বলে, অ্যানাটমি শিখতে চাও? সেটা তো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওর আর কী, পয়সা দিয়ে মড়া কিনবে, ছুরি দিয়ে কাটবে—

মড়া! জীবনের সঙ্গে সে খুঁজিতেছে জীবন্ত মানুষের সংযোগ ও সামঞ্জস্যের রীতি, মড়া কাটিয়া তার হইবে কী?

উৎসাহের সঙ্গে রাজকুমার পরেশকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিতে আরম্ভ করে।

পরেশ ডাক্তার মানুষ, রাজকুমারের কথা শুনিতে শুনিতে সে হাসিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

হাত দেখার ব্যাপারটা জানি, শরীর দেখাটা নতুন ঠেকছে।

তুমি হাত দেখায় বিশ্বাস করো না?

না। ওসব বুজরুকি।

তুমি যা জানো না তাই যদি বুজরুকি হয়—

আমি জানি না বলে নয়। একটা কিছু সম্ভবপর কি না সাধারণ বুদ্ধিতেই মোটামুটি বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ কখনও মানুষের হাতে লেখা থাকতে পারে। হাত দেখে কখনও বলা যেতে পারে একদিন মানুষের জীবনে কী ঘটবে না ঘটবে?

নগেনবাবু যে এক বছরের মধ্যে অন্ধ হয়ে যাবেন, তুমি কী করে জানলে?

সেটা ভিন্ন কথা। নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, চোখের এই অসুখে বছরখানেকের মধ্যে মানুষ অন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েকটা চেনা লক্ষণ দেখে তুমি জানতে পেরেছ, নগেনবাবুর চোখে অসুখ হয়েছে, কেমন? আগে আরও অনেকের চোখে এইরকম অসুখ হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যে তারা অন্ধ হয়ে গেছে, তুমি তাই বলতে পারছ নগেনবাবুও অন্ধ হয়ে যাবেন। মানুষের হাতেও তো চেনা লক্ষণ থাকতে পারে, যা দেখে এ রকম ভবিষ্যদ্‌বাণী করা চলে? যেমন ধরো—পরেশের হাত টানিয়া আঙুলগুলির ঠিক নীচে হাতের তালুতে চারটি চিহ্ন দেখাইয়া দেয়, এগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি ডাক্তারিতে তোমার কোনোদিন পশার হবে না।

হাত দেখার বুজরুকিতে পরেশের হঠাৎ গভীর কৌতূহল দেখা যায় আগ্রহের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করে, কী করে জানলে?

আরও অনেকের হাতে এ রকম চিহ্ন ছিল, দেখা গেছে তারা খুব ঢিলে অলস প্রকৃতির মানুষ। কোনো বিষয়ে চেষ্টাও থাকে না, পরিশ্রমও করতে পারে না। বছর পাঁচেকের মধ্যে তোমার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

পাঁচ বছর পরে সম্ভব?

তা বলা যায় না। তবে উন্নতি না হওয়ার লিমিট যে পাঁচবছর সেটা জোর করে বলতে পারি। বাপের পয়সাতেই এ কটা বছর তোমায় চালাতে হবে। অকস্থার ফেরে যদি স্বভাব বদলায়, হাতের এই চিহ্নগুলিও বদলে যাবে, তখন হয়তো তোমার কিছু হতে পারে।

বছর পাঁচেক সময় তাতে লাগবেই।

পরেশ মনে মনে চটিয়াছিল, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, তুমি এত বড়ো গণৎকার হয়ে উঠেছ তা তো জানতাম না। ডাক্তারি করার আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তো ভুল করেছি।

শুধু ডাক্তারি তো নয়, তা বলিনি আমি। ডাক্তারিতে পশার হবে না, এ কথা তোমার হাতে লেখা নেই। থাকলেও সে লেখা পড়বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার হাতে লক্ষণ আছে উন্নতি করার অক্ষমতার। নিজে উপার্জন করে বড়োলোক হওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই বলে তোমার যে টাকা হবে না তাও বলা চলে না। অন্য কেউ তোমার টাকা খাটিয়ে তোমাকে আরও বড়োলোক করে দিতে পারে, কোনো আত্মীয় মারা গিয়ে সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে, লটারির টিকিট কিনে টাকা পেতে পারো। তোমার হাত দেখে যদি বলি টাকা তোমার হবে না, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করো, সেটা হবে বুজরুকি। কিন্তু যদি বলি নিজের চেষ্টা আর পরিশ্রমে টাকা তোমার হবে না, সেটা হবে বিজ্ঞান। হাত দেখাও খানিকটা বিজ্ঞান, বাকিটা বুজরুকি। আর এই বুজরুকির জন্য খাঁটি জিনিসটুকুর ওপর লোকের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। বেশি ফাঁকির সুযোগ থাকলে বিজ্ঞান ভেস্তে যায়। ফুটপাতের তিলক-আঁটা উড়ে গণৎকারের মতো ডাক্তার গজাতে পায় না বলে তোমাদের লোকে বিশ্বাস করে, নিমুনিয়া হলে তোমরা অনেকে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করো, তবু।

তাই নাকি?

তাই। বিজ্ঞানের এত উন্নতি কেন সম্ভব হয়েছে জানো? জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কথাও কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, এই নিয়ম মেনে চলা হয়েছে বলে। সামান্য একটি আবিষ্কার পর্যন্ত তাকে প্রমাণ করতে হবে, আগে শ-খানেক আবিষ্কারে মানুষকে চমকে দিয়েছে বলেই যে তার একশো এক নম্বর আবিষ্কারটি মেনে নেওয়া হবে, তা চলবে না। অনুমান করার অধিকার আছে কিন্তু সেটা অনুমান বলেই ঘোষণা করতে হবে। আমি বলছি বলে কোনো কথা বিজ্ঞানে নেই।

সত্যি, ভারী আশ্চর্য তো!

রাজকুমার মনে মনে হাসে। ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই পরেশের কাছে প্রত্যাশা করা চলে। অকর্মণ্য অলস মানুষের স্থিতিশীল অকর্মণ্যতার এও একটা প্রমাণ। যা ভাবে না, যা জানে না, অন্যের কাছে তার ব্যাখ্যা শুনিতে এরা জ্বালা বোধ করে। মনে করে, তারই যেন সমালোচনা করিতেছে, উপদেশ দিয়া প্রমাণ করিতেছে তারই মূর্খতা।

আশ্চর্য বইকী, গাম্ভীর্যের ভান বজায় রাখিয়াই রাজকুমার বলিয়া যায়, আমি যে দেহ দেখে মানুষকে জানার কথা বলছিলাম তাও কতকটা হাত দেখার মতো। মানুষকে দেখে অনেক সময় তার স্বভাব চরিত্র টের পাওয়া যায় মানো তো?

কে জানে, জানি না।

যেমন ধরো সুরেশ। দেখলেই টের পাওয়া যায় ছেলেটা বিগড়ে গেছে! অনায়াসে

বলা যায় ছেলেটা লেখাপড়াও শিখবে না, মানুষও হবে না। যেখানে ওকে তুমি রাখো, যে কাজেই লাগিয়ে দাও, ও কখনও ভালোভাবে চলতে পারবে না।

সুরেশ পরেশের ছোটো ভাই—কদিন আগে অতি কুৎসিত একটা অপরাধে ছ-মাসের জন্য জেলে গিয়াছে। সুরেশের পাংশু শীর্ণ মুখে সদা চঞ্চল কুটিল দুটি চোখ দেখিলে অপরিচিত মানুষও সত্যসত্যই টের পাইয়া যাইত তার ভিতরটা কী রকম বিকারে ভরা।

পরেশ মুখ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

একটা রোগী দেখতে যাব।

বলিয়া সে চলিয়া যায় বাড়ির ভিতরে।

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। পথে চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে হয় পরেশকে না চটাইলেই হইত। এরকম শস্তা অভিমান দেখিলেই কেন যে তার আঘাত দিতে ইচ্ছা হয়। ছেলেবেলায় ফাঁপানো খেলনা বেলুন দেখিলেই যেমন ফুটা না করিয়া থাকিতে পারিত না, এখন ফাঁকা মানুষের সংস্পর্শে আসিলেই ফাঁকিতে খোঁচা দেওয়ার সাধটা তেমনই সে দমন করিতে পারে না। মানুষের সঙ্গে এই জন্য তার বনে না। আবেগ আর অভিমানে সায় দেওয়ার তোষামোদ জানে না বলিয়া আত্মীয় বন্ধু অনেকের কাছেই সে পছন্দসই লোক নয়। দশজনের সঙ্গে খাপ খাইয়া চলার প্রধান মন্ত্রটিই সে বাতিল করিয়া রাখে।

ভাবিতে ভাবিতে গভীর একাকীত্বের অনুভূতি তাকে বিষন্ন করিয়া দেয়। মানুষের সঙ্গ লাভের এমন একটা জোরালো কামনা সে অনুভব করে যেন বহুদিন জনহীন অরণ্যে বা প্রান্তরে বাস করিতেছে। ক্লাবের কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি সে সেখানে গিয়া হাজির হয়। টেনিস খেলার শখ জাগায় একদিন সে ক্লাবে যোগ দিয়াছিল, তারপর নিয়মিত চাঁদা দিয়া আসিতেছে কিন্তু ক্লাবে যাতায়াত করে কদাচিৎ। এই ব্যাপারটাও আজ যেন তার খেয়াল হইল প্রথম। ক্লাবের সে মেম্বার, ক্লাবে সুযোগ আছে খেলাধুলা ও দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করার, কিন্তু ক্লাবের জন্য কোনো আকর্ষণ সে অনুভব করে না। মানুষের সঙ্গ সে কি ভালোবাসে না? মানুষটা সে কি কুনো? অথবা দশজনের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না বলিয়া দশজনকে এড়াইয়া চলে?

স্যার কে এল প্রায়ই ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলিতে আসেন। তিনজন অর্ধপরিচিতের সঙ্গে ব্রিজ খেলিতে বসিয়া রাত নটার সময় বিরক্তিতে রাজকুমারের চোখে যখন প্রায় জল আসিয়া পড়ার উপক্রম করিয়াছে স্যার কে এল-ই তাকে উদ্ধার করিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ তুমি আজ এদিকে? রাজকুমার বলিল, আড্ডা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আড্ডা আমার একেবারে সয় না।

আমারও সয় না। তবু আড্ডা দিই।

পথে স্যার কে এল-এর এক বন্ধুর বাড়ি হইতে রিণিকে তুলিয়া নেওয়ার কথা ছিল। রিণি এখানে প্রায়ই রাত্রে টেনিস খেলিতে আসে। বিকালে সে খেলে না। খেলার

পর যে শ্রান্তি বোধ হয় তাতে নাকি বিকালটা তার মাটি হইয়া যায়। রিণির দেখাদেখি আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে নাকি বিকালের বদলে রাত্রে টেনিস খেলার সুবিধা বুঝিতে পারিয়াছে।

তখনও খেলা চলিতেছিল। শর্ট আর শার্ট পরা রিণিকে যে সে দেখিতে পাইবে রাজকুমার তা কল্পনাও করে নাই। জোরালো কৃত্রিম আলোয় রিণির দ্রুত সঞ্চরণশীল হালকা শরীরটি তার চোখে যেন নতুন একটা বিস্ময়ের মতো ঠেকিতে লাগিল। প্রতিপক্ষ দলের মেয়েটি শাড়ি পরিয়াই খেলিতে নামিয়াছে, মাঝে মাঝে রিণির দিকে চাহিয়া তার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিতেছে মৃদু হাসি।

খেলা দেখার জন্য দাঁড়াইয়া রাজকুমার শেষ পর্যন্ত দেখিয়া গেল শুধু রিণিকে।

খেলার শেষে রিণি বলিল, আরেকটু শীত না পড়লে খেলে আরাম নেই। যত শীত পড়ে তত তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে যায়।

রাজকুমার বলিল, না খেললে ঘাম হয় না।

ফ্যাট হয়। আর রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। বাড়ি গিয়ে স্নান করলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবে।

শরীর সম্বন্ধে রিণির যে এতখানি যত্ন আছে রাজকুমারের জানা ছিল না। স্যার কে এল-এর জন্য আজ গাড়িতে রিণির পাশে বসিতে না পারায় তার কেমন যেন ক্ষতি বোধ হইতে থাকে। রিণির গলা পর্যন্ত এখন ঢাকা, মুখ ফিরাইয়া কথা বলিতে গিয়া সে আবরণ সে যেন দেখিতে পায় না, টেনিস কোর্টের রিণিই যেন এত কাছে পিছনের সিটে বসিয়াছে মনে হয়। এই দেহাশ্রয়ী জীবটি আহ্লাদি মেয়ের মতো আদরের তাপে গলিতে চায়, শান্ত সুরক্ষিত সংস্কারময় অন্তঃপুরে স্বামী নামে প্রভুর তত্ত্বাবধানে বাস করিবার শুধু সে উপযোগী, এই সিদ্ধান্ত কি সে করিয়াছে এই রিণির সম্বন্ধে?

রাজকুমারের যেন ধাঁধা লাগিয়া যায়।

রিণির সাহস আছে, একগুঁয়েমি আছে, তেজ আছে। এইগুলি সে অর্জন করিয়াছে তার আত্মবিরোধী জীবন যাপনের প্রক্রিয়ায়। রিণিকে সে যদি তার নূতন চিন্তাধারার সন্ধান দেয়? রিণির কাছে সে যদি তার অসঙ্গত দাবি জানায়?

স্যার কে এল-এর একটা কথাও রাজকুমারের কানে যায় না, নিজে সে কী বলিতেছে আর রিণি কী জবাব দিতেছে তাও ভালো খেয়াল থাকে না। কথা বন্ধ করিয়া হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়।

শান্ত মনে কথাটা বিবেচনা করা দরকার। রিণিকে কিছু বলা না বলার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে, ঝোঁকের মাথায় কিছু করিয়া বসিলে চলিবে না। রিণি রাগ করিতে পারে, চিরদিনের জন্য তার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলিয়া দিতে পারে, মনে মনে তাকে ঘৃণা করিতে পারে, দুঃখ পাইতে পারে, হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। অনেক রকম সম্ভাবনাই আছে। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার।

কিন্তু অনুরোধটা জানাইলে রিণির কাছে কী রকম প্রতিক্রিয়া আশা করা উচিত সে বিষয়ে তাকে ভাবিতে হইতেছে কেন? ঠিক কী রকম প্রতিক্রিয়া হইবে এতদিন রিণিকে জানিয়া এটুকুও সে কি অনুমান করিতে পারে না?

রিণি বাড়ির মধ্যে চলিয়া যাইতেছিল, রাজকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে রিণি। খুব দরকারি কথা।

রিণি আশ্চর্য হয় না। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ খাপছাড়া উত্তেজনার সঙ্গে খুব দরকারি একটা কথা বলিতে চাওয়া, রিণি তার মানে জানে। ঠিক এমনিভাবে ওরা চিরদিন কথাটা জানায়। বলার সুযোগ যখন থাকে তখন কিছু বলে না, আজ-কালের মধ্যে আবার সুযোগ আসিবে জানিয়াও অপেক্ষা করিতে পারে না, অসময়ে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

কী কথা?

ঘরে চলো, বলছি।

দু-চার মিনিটে বলা হবে না বোধ হয়?

না। একটু সময় লাগবে। অনেক কথা বুঝিয়ে বলতে হবে তোমাকে।

আমারও বুঝতে সময় লাগবে নিশ্চয়। মালতীর মতো বুদ্ধি তো নেই।

রিণির এই ঈর্ষার খোঁচাটা রাজকুমারকে তিরস্কারের মতো আঘাত করিল। মালতীর কথা তার মনেই ছিল না। নূতন চিন্তাটাই কিছুদিন হইতে তার মন জুড়িয়া আছে। মালতী নামে যে একটি মেয়ে আছে জগতে, গত বর্ষার এক সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিকে যে জগতের অন্য সব মেয়ের চেয়ে সে কাছে আসিতে দিয়াছে, এসব সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল।

মালতীকে সে আর পড়ায় না। এবার মালতীর পরীক্ষা, ভালোভাবে পাশ করার আগ্রহ তার চিরদিন খুব প্রবল। রাজকুমারের কাছে পড়িলে তার আর পাশ করার ভরসা নাই। রাজকুমার তাই নিজেই পড়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীও আপত্তি করে নাই। তার আসা-যাওয়া যে একেবারে কমিয়া গিয়াছে, বাদ পড়িয়াছে অতি প্রয়োজনীয় অনাবশ্যক কথা বলা, সে জন্যও মালতীর কাছ হইতে কোনো নালিশ আসে নাই। হয়তো মালতী ভাবিয়াছে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটানোর ভয়ে সে যায় না, পরীক্ষার আগে আবেগ ও উত্তেজনায় তাকে একটি দিনের জন্যও অশান্ত করিতে চায় না। ভাবিয়া মালতী হয়তো কৃতজ্ঞতাই বোধ করিতেছে।

তার ব্যবহারে মালতী দুঃখ পায় নাই—এই যুক্তি কিন্তু রাজকুমারের নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখিতে কাজে লাগে না। শ্যামলের কথাটা তার মনে পড়িয়া যায়। শ্যামল বলিয়াছিল, মালতীকে ভালোবাসিবার উপযুক্ত সে নয়। অসঙ্গত বলিয়া জানিলেও কথাটা এখন তাকে পীড়ন করিতে থাকে। রিণির কাছে যে প্রস্তাব করিতে সে চাহিতেছে, জানিতে পারিলে মালতী ব্যথা পাইবে। সে ব্যথার স্বাদ কত কটু, কত তীব্র তার জ্বালা, রাজকুমার অনুমান করিতে পারে। মালতী তার উদ্দেশ্য বুঝিবে না। রিণির রূপ যে সে

দেখিতে চায় না, রিণিকে অনুরোধটা জানানোর আগে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হওয়া আর গলা শুকাইয়া যাওয়ার কারণ যে মনের কোনো দুর্বলতা নয়, মালতি তা ধারণাও করিতে পারিবে না, বিশ্বাসও করিবে না। মালতির কাছে সে উদারতা প্রত্যাশাও করা চলেনা। আহত-বিস্ময়ে কত কী যে মালতী ভাবিবে। ক্ষোভ, দুঃখ, ঈর্ষা ও ক্রোধে আরও কত আঘাত যে নিজের জন্য নিজেই সে চয়ন করিবে।

তবে, হয়তো মালতী জানিবে না। না জানার সম্ভাবনাই বেশি। রিণি যদি রাগ করে, চিরদিনের জন্য যদি তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দেয়, কারও কাছে সে কোনোদিন বলিতে পারিবে না, ছদ্মবেশী এক বুনো জানোয়ারের কোনো দাবি একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল।

মালতী জানিবে না। তবু রাজকুমার অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত সংস্কারের অবাধ্য প্রতিবাদ একটানা চাপের মতো মনে অশান্তি জাগাইয়া রাখে। মালতীর না জানা তো বড়ো কথা নয়! মালতীর জানার ফলাফলটা সে যতখানি কল্পনা করিতে পারে তারই গুরুত্ব যেন সকলের আগে বিবেচ্য। জানুক, বা না জানুক, আঘাত পাক বা না পাক, যে কাজ করিলে একটি মেয়ের সুখ-শান্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে কাজ করা তার উচিত নয়। মনে তার পাপ নাই?—না থাক। পুণ্যের জন্যও অনেক কাজ সংসারে করা যায় না।

রিণির সঙ্গে গুরুতর বুঝাপড়ার লড়াই শুরু করিবার ঠিক আগে এ সব চিন্তা রাজকুমারকে একটু কাবু করিয়াছিল বইকী। কালও যা করা চলিবে আজ তা না করিয়া পালানোর কথাটাও একবার তার মনে আসিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিবার জন্য আর একটু সময় নিলে কী আসিয়া যায়? হঠাৎ যেন একটু ভয় করিতে লাগিল রাজকুমারের ভাবনা তার ছিল অনেক, এতক্ষণ ভয় এতটুকু ছিল না।

সময় যদি লাগে, তাহলে তুমি বোসো। নেয়ে এসে তোমার দরকারি কথা শুনব।

না, আগেই শুনে যাও।

বেশিক্ষণ লাগবে না নাইতে। মিনিট কুড়ি। কথাটা ততক্ষণ মনে মনে গুছিয়ে নাও বরং, বলতে সুবিধে হবে।

রিণি একটু হাসিল। এমন মধুর হাসি রাজকুমার কোনোদিন তার মুখে দ্যাখে নাই। রিণি যেন হঠাৎ আজ কেমন হইয়া গিয়াছে।

তবে আজ থাক, রিণি।

থাকবে কেন? তোমার আজ কী হয়েছে বল তো? খেলে এসে না নাওয়া পর্যন্ত আমার কী বিশ্রী লাগে তুমি বুঝবে না। বলতে চাও বলো, শুনতে কিন্তু আমার ভালো লাগবে না বলে রাখছি।

কথাটা শোনো আগে, বুঝতে পারবে নাইতে যাওয়ার আগে কেন বলতে চাই। আমি বাথরুমে থাকব, রিণি।

বাথরুমে থাকবে?

তোমার নাওয়া দেখব। তুমি নাইবে, আমি এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকব চুপ করে।

রিণি কথা বলিতে পারে না। জোরে তার দাঁতে দাঁত আটকাইয়া গিয়াছে, মুখ দেখিলেই বুঝা যায়। রাজকুমার সোজা তার চোখের দিকে তাকায়। দ্বিধা সংকাচ ভয় সব তার এতক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে।

কথাটা তোমার খুব অন্যায় মনে হচ্ছে? এখানে বোসো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি।

বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি বুঝেছি। কোথায় গিয়েছিলে বাবার সঙ্গে? কটা পেগ গিলেছ?

পেগ? ও সব আমার নেই তুমি জান না?

এতদিন তাই তো জানতাম।

আজ আমার কথা শুনে ধারণাটা বদলে গেছে, না? আমার সব কথা কিন্তু শোনোনি রিণি।

হাত ধরিয়া রিণিকে একরকম সে জোর করিয়া একটা সোফায় বসাইয়া দিল। বড়ো রাগ হইতেছিল রাজকুমারের। এত কথা ভাবিবার থাকিতে রিণি কিনা ভাবিয়া বসিল মদ গিলিয়া সে তার সঙ্গে ফাজলামি করিতে আসিয়াছে।

আগ্রহের সঙ্গে সে রিণিকে সব বুঝাইয়া দিতে থাকে। বিশেষ করিয়া জোর দেয় তার নিষ্পাপ নির্বিকার মনোভাবের উপর, তার উদ্দেশ্যের আসল মানের উপর। কী আবেগের সঙ্গেই সে যে বারবার ঘোষণা করে, বাথরুমে রিণিকে দেখিতে চাওয়ার মতো অভদ্র ছোটোলোক সে নয়, ও রকম ইচ্ছা জাগার মতো হীন নয় তার মন।

ব্যাখ্যা করিতে রাজকুমার চিরদিনই ওস্তাদ। বুঝিতে রিণির আর কিছুই বাকি থাকে না। মুখের ভাবে তার পরিবর্তন কিন্তু হয় আশ্চর্য রকম, রাজকুমারের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মনে হয়, রাজকুমারের প্রস্তাব শুনিয়া তার যেন শুধু চমক লাগিয়াছিল, রাজকুমার মদ খাইয়া আসিয়াছে ভাবিয়া তার যেন শুধু দুঃখ হইয়াছিল। এতক্ষণে তার রাগ হইয়াছে, ব্যাখ্যা শুনিবার পর, সব বুঝিবার পর।

বুঝতে পেরেছ রিণি?

পেরেছি বইকী।

গলার আওয়াজেই রাজকুমার সচেতন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ সুরকে চাপিয়া এ ভাবে দাঁতে কাটিয়া রিণিকে সে আর একদিন কথা শুনিয়াছিল। গানের আবেশে বিহ্বলা রিণির বাড়ানো মুখের আমন্ত্রণ যেদিন সে গ্রহণ করে নাই। সেদিনও রিণির নাক এমনি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল রাগের মাথায় হঠাৎ বুঝি কামড়াইয়া দিবে—দুরন্ত ছোটো মেয়েরা যেমন দেয়।

ম্লান মুখে রাজকুমার একটু হাসিল।

জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, তুমি রাজি নও বুঝতে পারছি।

বুঝবে বইকী। তুমি তো বোকা নও।

কিছু মনে কোরো না রিণি।

না। মনে আবার কী করব।

আমি তবে যাই।

যাও। আর এসো না।

আচ্ছা।

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা তুমি আর একটু উদারভাবে নেবে ভেবেছিলাম, রিণি।

রিণিও উঠিয়া দাঁড়াইল।

তোমায় বোকা ভাবতে পারলে তাই নিতাম। তুমি তো বোকা নও।

রাজকুমার চলিয়া যায়, রিণি পিছন হইতে তাকে ডাকিল।

একটা উপদেশ নিয়ে যাও। আর একটি মেয়েকে যখন কথাটা বলবে, মালতীকেই বলবে বোধ হয়, কিছু বুঝিয়ে বলতে যেও না। শুধু বোলো যে তোমার এ সাধটা না মেটালে তুমি পাগল হয়ে যাবে, সায়ানাইড খাবে। হয়তো রাজি হতে পারে।

রিণি কিছুই অস্পষ্ট রাখে নাই। কয়েকটি কথাতেই সব পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছে। যতই অসঙ্গত হোক, শুধু তার ইচ্ছার কথা হইলে নিজের নিরাবরণ দেহটি তাকে দেখাইতে রিণি রাজি হইলেও হইতে পারিত। সত্যসত্যই রাজি সে হয়তো হইত না, কিন্তু একটু দোমনা তো অন্তত হইত। একবারের জন্যও মনে তো হইত কী আসিয়া যায় মানুষটার ব্যাকুল প্রার্থনা মিটাইলে? বিমুখ করিয়া একটু আপশোশও হয়তো জাগিত। নিজের জন্য আবেদন জানানো ছাড়া রিণির মন এটুকু নরম করারও আর কোনো উপায় নাই। কেবল রিণির নয়, সব মেয়ের সম্বন্ধেই এই এক কথা। রিণি তাই বলিয়াছে।

রাজকুমার কি কথাটা জানে না? যুক্তির দাম মেয়েদের কাছে নাই, একটুখানি আবেগের বন্যায় বিশ্বের সমস্ত যুক্তি-তর্ক উচিত-অনুচিত ভালো-মন্দ ভাসিয়া যাইতে পারে, একটু জ্ঞান কি সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই এতদিনে? রাজকুমার লজ্জা বোধ করে। রিণি তাকে বোকা মনে করিতে অস্বীকার করিয়াছে, বোকামি কিন্তু সে করিয়াছে সত্যই। সায়ানাইড খাওয়ার কথা বলিলে রিণি গর্ব বোধ করিবে আর নিছক একটা থিওরি যাচাই করিতে তার সাহায্য চাহিলে সে বোধ করিবে অপমান, এটুকু তার খেয়াল রাখা উচিত ছিল।

তাছাড়া, রিণি প্রত্যাশা করিয়াছিল অন্য কথা। রাজকুমার বিশ্বাস করে না রিণি তাকে ভালোবাসে; তাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভালো না বাসিলেও ভালোবাসার ঘোষণা শুনিতে কে না ভালোবাসে? এদিকটাও তার খেয়াল করা উচিত ছিল।

নিজের চারকোনা ঘরে চারকোনা খাটে রাজকুমার চিত হইয়া পড়িয়া থাকে আর উত্তেজিত চিন্তা ছুটাছুটি করে তার মনে। সিলিং-এর হাত তিনেক নীচে একটা মাকড়সা শূন্যে ঝুলিয়া আছে, সূক্ষ্ম অবলম্বনটি চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়া মাকড়সাটি আরও হাতখানেক নীচে পড়িয়া যায়। রাজকুমারের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া ওঠে। না, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার চেয়ে তার ব্যর্থতাই ভালো।

জীবনে আর কোনো মেয়ের কাছে এ দাবি সে করিবে না।

এক কাপ চা আনিয়া কালী বলে, এখন চা খেলে ভাত খাবেন কখন? খিদে নষ্ট হয়ে যাবে।

খিদে থাকলে তো নষ্ট হবে।

খিদে নেই কেন?

ধরো খেয়ে এসেছি?

ধরো খেয়ে এসেছি মানে? খেয়ে এলে খেয়ে এসেছেন, নয়তো খেয়ে আসেননি। কোথায় খেলেন? কী খেলেন?

রাজকুমার মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, একটা মেয়ে খাইয়ে দিয়েছেন কালী। এত খাইয়েছে কী বলব। পেট ভরে বুক ভরে মাথা পর্যন্ত ভরে গেছে।

মাথা ধরেছে? শঙ্কিত কালী প্রশ্ন করে।

ধরেনি, ভরেছে।

রাজকুমারের হাসির জবাবে কালী কিন্তু হাসে না। মুখ ভার করিয়া বলে, আপনার শুধু মেয়ে বন্ধু, গন্ডা গন্ডা মেয়ে বন্ধু। বেটাছেলের অত মেয়ে বন্ধু থাকতে নেই।

তাহলে তো তোমার সঙ্গে আড়ি করতে হয়।

আমি তো বন্ধু নই। আমি অনেক ছোটো।

ওরাও বন্ধু নয় কালী। ওরাও আমার চেয়ে অনেক ছোটো, ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ। কালী অদ্ভুত অবজ্ঞার হাসি হাসে, ধেড়ে ধেড়ে সব মেয়ে, বিয়ে হলে অ্যাদ্দিন—

সাত ছেলের মা হত, না?

কালী সায় দিয়া বলে, বিয়ে হয়নি কেন ওদের? পাত্র জোটেনি?

নাঃ, কই আর জুটল? আমি একবার বলেছিলাম ওদের, এসো তোমাদের সবাইকে আমি বিয়ে করছি। ওরা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে তো সব, ভারী চালাক। প্রত্যেকে বলতে লাগল, আমায় আগে বিয়ে কর, তারপর আর সবাইকে বিয়ে করবে। তার মানে বুঝতে পারছ?

খুব পারছি। একবার বিয়েটা হয়ে গেলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে দেবে না, একা বউ হয়ে থাকবে। আমি তো মেয়ে, মেয়েদের ব্যাপার আমি সব জানি।

রাজকুমারও ক্রমে ক্রমে সেটা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতেছিল। আজকাল

কালীর মুখ ফুটিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে হালকা অথবা ভারী চালে সে অনর্গল আলাপ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতার অভাব আছে কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞানের তার অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু তার যে সরলতা মুগ্ধ করে সেটা ভান নয়, মুগ্ধ করার ক্ষমতাই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। রিণি-মালতী-সরসীর চেয়ে কালী বোকা নয়। কালীও সব বিষয়ে ওদেরই মতো। ওদের সঙ্গে কালীর তফাত দুপুরের রোদের সঙ্গে সকালের রোদের তফাতের মতো।

সহজভাবে নিশ্চিন্ত মনে কালীর সঙ্গে কথা বলা যায়। এ ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলিবার সুখটা রাজকুমারের এতদিন জানা ছিল না। কথা বলার আগে কিছু ভাবিতে হয় না, ভাবিবার সময় কথা বলিয়া যাইতে হয় না। যতক্ষণ খুশি কথা বলো, এক মিনিট অথবা এক ঘন্টা। কথা বলিতে চাও বলো, কথা শুনিতে চাও শোনো, নয়তো খুশিমতো চুপ করিয়া থাকো, বধির হইয়া যাও। সবই স্বাভাবিক, কেউ রাগ করিবে না। বলার কথাও খুঁজিতে হয় না। রিণি-মালতী-সরসীর সঙ্গে কথা বলার সময় কতবার বলার কথা না থাকায় অস্বস্তি বোধ করিতে হইয়াছে, টানিয়া আনিতে হইয়াছে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি অথবা চেনা মানুষের সমালোচনা। ছেলেমানুষি আবোলতাবোল কথা শুধু কালীর সঙ্গে বলা যায়।

মনোরমা হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া থাকে, ঘরে দুজনের গল্প চলে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেলে কালী কোণের টুলটা কাছে আনিয়া বসে। কালীর প্রসাধনের গন্ধটি তেজি ও স্পষ্ট। রিণি-মালতী-সরসীর মতো কেবল সুবাসের মৃদু ইঙ্গিত নয়।

হঠাৎ এক সময় মনোরমার এদিকে ভয় হয়। এত দেরি? রাজকুমারের সম্বন্ধে ভাবনার কিছু নাই বটে, তবু, এত দেরি? বিবাহের আগে শুধু একদিন একজনের সঙ্গে মনোরমা আধঘন্টা নির্জনে গল্প করিয়াছিল। কেউ বাধা দিয়া গল্পের সমাপ্তি ঘটায় নাই, বাধা সে দিয়াছিল নিজেই, নিজেকে বাঁচানোর জন্য। ভাবিয়াছিল, তাই উচিত। দুদিন পরে যার সঙ্গে বিবাহ হইবে, এখন তার কাছে ধরা না দেওয়াটাই নিয়ম। আজ অসময়! কিন্তু আর তো আসিল না সে মানুষটি? মনোরমা জানে, সেদিন ধরা দিলে সে আসিত। দুদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য। সে তো বুঝিতে পারে নাই মনোরমার মনের কথা, হাত ধরা মাত্র তার রক্তেও কী আগুন লাগিয়াছিল। আজও তার তাপে মনোরমার মন জ্বলিয়া যায়। সে ভাবিয়াছিল, মনোরমা বুঝি ঠাণ্ডা, মন তার বরফের দেশ। কল্পনার শীতল মনোরমা তার ভালোবাসাকে জুড়াইয়া দিয়াছিল। তাছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে তার না আসার, মনোরমাকে বিবাহ না করার?

সাড়ে নটার সময় কালী চা দিতে গিয়াছে, সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল। মনোরমার বুক টিপটিপ করে। এত দেরি। খাইতে আসার তাগিদ দিতে রাজকুমারকে ডাকিতে গিয়া কালীকে বাঁচানোর জন্য মনটা ছটফট করে মনোরমার। কিন্তু সে উঠিতে পারে না। শুধু

আজের জন্য বাঁচাইতে গিয়া সে যদি কালীর চিরদিনের মরার ব্যবস্থা করিয়া বসে?

তারপর কালীর তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ কানে আসে। মনোরমা জোরে নিশ্বাস ফেলে। সর্বাঙ্গে তার কয়েকবার শিহরন বহিয়া যায়। পিঁড়িটা ঠেলিয়া দেয়ালের কাছে গিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া সে চোখ বোজে। হাসি । আর ভয় নাই। যেখানে হাসি আছে সেখানে কোনো ভয় নাই।

রাজকুমার একদিন সন্ধ্যার পর মালতীর খোঁজ করিতে গেল। এইটুকু পথ যাইতেই চোখে পড়িল আলো আর দেবদারু পাতায় সাজানো তিনটি বাড়ি। ছাতে শামিয়ানা, শানাই বাজিতেছে। অগ্রহায়ণ মাস, চারিদিকে বিয়ের ছড়াছড়ি। রাজকুমারের মনে পড়ে, একটি বন্ধুর বিবাহে তার নিমন্ত্রণ ছিল। দুটি বছর খুঁজিয়া বাছিয়া একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে পছন্দমতো। এ পছন্দের মানে রাজকুমার জানে। মেয়েটি সুন্দরী নয়, রং খুব ফরসা। তার আর একটি বন্ধু এ রকম বাছাই করা এক মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। অমন রূপ নাকি খুব কম দেখা যায়। বউ দেখিয়া তাকে নিজের বউ হিসাবে কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠিয়াছিল, এমন কুৎসিত ছিল সেই অত্যন্ত ফরসা রঙের মেয়েটি।

মালতীর বাড়ি গিয়া দেখা গেল, সরসী আর রুক্মিণী আসিয়াছে। দুজনেই বিশেষভাবে সাজিয়াছে, মালতীও দামি কাপড় পরিয়া নামিয়া আসিল তিনজনে বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে, শ্যামলের সঙ্গে।

নিমন্ত্রণে যাওয়ার আগ্রহ তিনজনেরই প্রবল, শ্যামলের দেরির জন্য কারও কিন্তু বিরক্তি দেখা গেল না।

বোন আর বউদিকে নিয়ে আসবে।—মালতী বলিল।

দেরি করার অপরাধ তাই শ্যামলের নয়। দুটি মেয়েকে সঙ্গে আনিতে হওয়ায় দেরি যে তার হইবে, এটা সকলে ধরিয়াই রাখিয়াছে।

রাজকুমার বলিল, আমি তবে বিদায় হলাম।

সরসী বলিল, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে?

অনাহূত?

অনাহূত মানে? ধীরেনবাবু তোমায় বলেননি?

তোমরা ধীরেনের বিয়েতে যাচ্ছ নাকি? এ তো ভারী আশ্চর্য যোগাযোগ হল।

আশ্চর্য যোগাযোগ আবার হল কোনখানটায়? তুমি ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, আমি চেষ্টা করে একটা চেনা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা যাচ্ছি কন্যাপক্ষে, তুমি যাবে বরযাত্রী হয়ে। এ তো সোজা কথা।

আগে জানিলে কথাটা সোজাই মনে হইত। একটা বিবাহ ঘটানোর গর্বে এখন বিশ্বের সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরসীর আয়ত্তে আসিয়াছে, আশ্চর্য কিছু ঘটিবার

উপায় নাই। রাজকুমার যে ঠিক আজ সন্ধ্যাতেই অনেকদিন পরে মালতীর খোঁজ করিতে আসিয়াছে, তাও সরসীরই বাহাদুরি। ধীরেনের দু-বছর খোঁজার পর পছন্দমতো মেয়ে পাওয়ার ব্যাপারটা রাজকুমার এবার বুঝিতে পারে। সরসীই তাকে মনে পড়াইয়া দেয় তার বাড়িতে মেয়েটিকে রাজকুমার একদিন দেখিয়াছিল। না, দু-বছর খুঁজিয়া পছন্দ করার মতো মেয়ে সে নয়। তবে মাঝখানে সরসী ছিল। সেই পছন্দ করাইয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। সরসী সব পারে।

সকলকে আড়াল করিয়া সরসী একাই তার সঙ্গে কথা বলে। চিরদিন এই তার রীতি। দেখা হওয়া মাত্র রাজকুমারকে সে দখল করে। মনে হয়, রাজকুমারের জন্যই সে যেন ওত পাতিয়া ছিল। তার সভাসমিতি করিয়া বেড়ানোর মানে আর কিছুই নয়, রাজকুমারের অদর্শনের কটা দিন বাজে বাজে কোনো রকমে সে সময় কাটায়।

মালতী বলে, তোমায় কেমন আনমনা ঠেকছে আজ?

সরসী সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের হইয়া জবাব দেয়, কবিত্ব করিস নে মালতী, থাম। একটা মানুষ ভালো করে চুল না আঁচড়ালেই তোর কাছে আনমনা ঠেকে। চিরুনিটা দেখি তোর।

সরসী নিজেই মালতীর চিরুনি দিয়া রাজকুমারের চুল ঠিক করিয়া দেয়। তার পিছনে দাঁড়াইয়া মালতী একটু হাসে।

রুক্মিণী বলে, চুল আঁচড়ালে কী হবে, রাজকুমারবাবুর চেহারাটাই কবির মতো।

সরসী মুখে একথার প্রতিবাদ করে না, শুধু ভৎসনার দৃষ্টিতে রুক্মিণীর মুখের দিকে তাকায়। রুক্মিণী একেবারে বিব্রত হইয়া পড়ে। কারও চেহারা কবির মতো, এ কথা বলা কি অসঙ্গত? প্রশংসার বদলে তাতে কি নিন্দা বুঝায়? কে জানে। অথচ সদ্য পরিচিত একজনকে ঠিক এই কথা বলায় পরদিন সকালে সে বাড়ি আসিয়া রুক্মিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি সে আবার বলিতে যায়, কবির মতো চেহারা মানে—

সরসী বলে, মানে ওকে তোমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে।

এবার রুক্মিণী নির্ভয়ে সহজভাবে জবাব দেয়, তা হয়েছে। তবে একপক্ষের পছন্দে আর লাভ কী।

রাজকুমার মনে মনে তার নিজস্ব অপদেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। কিন্তু উপায় তো নাই, কথার পিঠে কথা চাপাইতেই হইবে। কোনো রকমে একটু হাসিয়া সে বলে, এ অনুমানটা আপনার ভুল।

ভুল নয় রাজকুমারবাবু, প্রমাণ আছে। পছন্দ দূরে থাক, আমায় আপনি অপছন্দ করেন।

আগে আপনার প্রমাণ দাখিল করুন, আসামি জবাবাদিহি করবে।

রুক্মিণী মৃদু মৃদু হাসে। এ ধরনের আলাপের সময় সকলেই হাসে, তবে ঠিক এ

ভাবে নয়। কেমন যেন বাঁকা বাঁকা রুক্মিণীর হাসি। বুঝা যায়, সরসী অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া আছে।

রুক্মিণী বলে, যেমন ধরুন, যাকে পছন্দ করে তার বাড়ি লোকে না ডাকতেই যায়। যাকে পছন্দ করে না যাওয়ার কথা থাকলে তার বাড়িতেও ভদ্রতার খাতিরে যায়। যাকে অপছন্দ করে তার বাড়িতে যাওয়ার সব ঠিক থাকলেও যায় না।

তাই বটে। রুক্মিণী একদিন তাকে বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেও যাইবে বলিয়াছিল। কবে কটার সময় যাইবে তাও ঠিক ছিল। তারপর রুক্মিণীর অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গিয়াছিল। না যাওয়ার অজুহাত দিয়া ক্ষমা চাহিয়া একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখে নাই। রুক্মিণী আহত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে। রাগ করার কথাই।

রাজকুমারের বিপদের টের পাইয়া সরসী মুখ খোলে।

কেন, রাজকুমারের চিঠি পাওনি তুমি?

রুক্মিণী বলে, চিঠি? কীসের চিঠি?

সরসী বলে, আমার সামনে ও যে তোমায় চিঠি লিখল? হঠাৎ শিলং যেতে হল ওকে, নিজেই বলতে যাচ্ছিল তোমাকে, আমি বললাম চিঠি লিখে দিলে চলবে। চিঠি পোস্ট করেছিলে তো রাজকুমার?

রাজকুমার বলে, নিশ্চয়।

সরসী বলে, চিঠির কোনো গোলমাল হয়েছিল বোধ হয়। পোস্টাপিসের ব্যাপার তো।

পোস্টাপিসের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া সরসী ব্যাপারটা শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু রুক্মিণী নরম হইলেও এত সহজে রাজকুমারকে রেহাই দিতে পারে না।

শিলং থেকে ফিরে একদিন আসতে পারতেন তো?

এবার আত্মরক্ষার দায়িত্ব রাজকুমারের, সে দুঃখের ভান করিয়া বলে, এমন ব্যস্ত ছিলাম, কী বলব আপনাকে। তা ছাড়া, হঠাৎ গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতেও ভরসা পাইনি।

আচ্ছা, এবার হঠাৎ গিয়ে আমায় বিরক্ত করার নেমন্তন্ন করে রাখলাম। ভুলবেন না যেন। বলিয়া রুক্মিণী এতক্ষণ পরে ক্ষমার সহজ হাসি হাসিল। অর্থহীন দীর্ঘ ভূমিকার পর।

রাজকুমার ভাবিতে লাগিল, সভ্যতার নামে এরা কী অসভ্যতাই শিখিয়াছে। প্রথমে দেখা হওয়া মাত্র এই হাসি হাসিলে কত সহজ হইয়া যাইত মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করার ইচ্ছা জাগানো।

খানিক পরেই শ্যামল আসিল। ব্যস্ত সমস্ত, উদ্‌বিগ্ন শ্যামল। একঘন্টার বেশি দেরি করিয়া ফেলার অপরাধে সে যেন নিজের মরণ কামনা করিতেছে। সঙ্গে তার বোন সুধা ও বউদিদি ইন্দিরা। দুজনের সাজসজ্জা একেবারে চমকপ্রদ। শ্যামলের যে মোটে

ঘন্টাখানেক দেরি হইয়াছে তাই আশ্চর্য।

রাজকুমারকে দেখিয়া শ্যামলের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। রাজকুমার মালতীকে পড়ানো ছাড়িয়া দিয়াছে জানিয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল।

রাজকুমার মাঝে মাঝে আসে তা সে জানিত কিন্তু সেদিন বর্ষা-সন্ধ্যার ব্যাপারটির পর রাজকুমারকে সে এ বাড়িতে দ্যাখে নাই।

রাজকুমার বলিল, কেমন আছ শ্যামল?

শ্যামল জবাব দিল না।

প্রশ্নের জবাব না দিবার সাধারণ কারণ থাকা সম্ভব মানুষের। হয়তো শ্যামল শুনিতে পায় নাই। মেয়েদের বিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার হাঙ্গামায় যে রকম ব্যতিব্যস্তই সে হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেদিন মিটিং-এর কথাটা সকলের মনে ছিল। সকলেরই তাই মনে হইল, সেদিনের অপমানের জন্যই বুঝি শ্যামল রাগ করিয়া রাজকুমারের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মালতীই যেন বিব্রত হইয়া পড়িল সকলের চেয়ে বেশি। শ্যামলকে সে একপাশে ডাকিয়া নিয়া গেল।

রাজুদার সঙ্গে কথা বল না?

না।

কেন ?

ইচ্ছে হয় না।

ছি ছি, কবে সেই মিটিং-এ কী হয়েছিল, আজও তা মনে করে রেখেছ? দোষ তো ছিল তোমার। তুমি কেন গায়ে পড়ে—

সে জন্য নয়। ও একটা রাস্কেল মালতী।

উত্তেজিত অবস্থায় না থাকিলে কথাটা শ্যামল বলিয়া ফেলিত না। অত বোকা সে নয়। মালতীর মুখের সঙ্গে নিজের মুখখানাও তার বিবর্ণ হইয়া গেল।— তোমার বড্ড মাথা গরম। কাকে কী বলো ঠিক নেই। রাজুদা তোমাকে দশবছর পড়াতে পারে, তা জানো?

পেটে বিদ্যে থাকলেই লোকের মনুষ্যত্ব থাকে না।

রাজুদার মনুষ্যত্ব নেই, মনুষ্যত্ব আছে তোমার। লোকের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা বলতে পারো না তুমি। ওর তুলনায় তুমি তো কেঁচো।

মালতী ছিটকাইয়া রাজকুমারের কাছে সরিয়া গেল।

চলো, আমরা যাই।

চলো।

শ্যামল কোথা হইতে কার একটি গাড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। একটা গাড়িতে এতগুলি মানুষের যাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্তত দুজনের ট্রামে বা বাসে যাইতেই হইত। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো কথা উঠার আগেই মালতী চুপিচুপি রাজকুমারকে বলিল, শ্যামলের

গাড়িতে আমি যাব না। চলো, আমরা ট্রামে যাই।

গাড়িতে যে জায়গা কম পড়িবে, এতক্ষণ সকলের সেটা খেয়াল হইয়াছিল। সরসী বলিল, গাড়িতে তো কুলোবে না সকলের। আমি বরং রাজকুমারের সঙ্গে—

মালতী তখন পথ ধরিয়া কয়েক পা আগাইয়া গিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, তোমরা গাড়িতে যাও। আমরা দুজন ট্রামে যাচ্ছি। এসো।

সরসীর চোখের সামনে রাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া মালতী বড়ো রাস্তার দিকে চলিয়া গেল।

একটা ট্রাম সমুখ দিয়া চলিয়া গেল।

মালতী বলিল, না। পরের ট্রামে।—এখনও থাকিয়া থাকিয়া মালতী কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কী হয়েছে মালতী?

শ্যামলের সঙ্গে কোনোদিন আমি যদি কথা বলি—

এতক্ষণে গলা ধরিয়া মালতীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

কী করেছে শ্যামল?

আমায় অপমান করেছে।

অপমান করেছে? কী অপমান?

তোমায় রাস্কেল বলেছে।

আমায় রাস্কেল বলেছে তাতে তোমার অপমান হল কেন?

চুপ করো। তামাশা ভালো লাগে না। যা হচ্ছে আমার! শ্যামল কিনা বলে তোমার মনুষ্যত্ব নেই। নিজে থেকে ভিখারির মতো আসে, দয়া করে হেসে কথা কই, তাইতে ভেবেছে, কী না জানি মহাপুরুষ হয়ে গেছি আমি। এবার বাড়িতে এলে দূর করে তাড়িয়ে দেব।

অত রাগ কোরো না, মালতী। বেচারি তোমায় ভালোবাসে, সেদিন জানালা দিয়ে আমাদের দেখে ওর মাথা বিগড়ে গেছে। আমাকে গাল তো দেবেই।

মালতী সন্দিগ্ধভাবে বলিল, ভালোবাসে না ছাই। অত ছোটো মন নিয়ে কেউ ভালোবাসতে পারে?

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, ভালোবাসে বলেই তো মন ছোটো হয়েছে। তাছাড়া, আমার ওপর ওর রাগের আর একটা কারণ আছে,

জানি, কাদের বাড়ির মেয়ের হাত ধরেছিলে তো?

রাজকুমার আশ্চর্য হইল না।

শ্যামল বলেছে?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না এমনিই শুনেছি। সবাই জানে। ও সব লোকের বাড়িতে যাওয়ার কী দরকার ছিল তোমার?

দরকারের কথা পরে বলছি। জেনেও তুমি চুপ করেছিলে যে?

তুমিও তো চুপ করে ছিলে?

রাজকুমার কিছুক্ষণ কথা বলিল না। আর একটি ট্রাম সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে এত তুচ্ছ ছিল মালতী, বলার কোনো দরকার বোধ করিনি। পরে যখন দেখলাম আমার কাছে তুচ্ছ হলেও অন্যের কাছে তুচ্ছ নয়, তখন বলব ভেবেছিলাম। সময়মতো নিজেই বলতাম।

আমিও জানতাম তুমি সময়মতো নিজেই বলবে। তাই চুপ করেছিলাম। কিন্তু শ্যামলের কী স্পর্ধা! তোমার সমালোচনা করতে যায়।

আর একটি ট্রাম আসিতে দেখিয়া মালতী বলিল, যাবে? আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না।

রাজকুমার বলিল, না চলো। সকলের সামনে বিয়েবাড়ি যাব বলে বেরিয়েছি, না গেলে ওরা কী ভাববে?

মালতী হাসিল, লোকে কী ভাববে, তুমি আবার তা ভাবো নাকি? পরের বাড়ির মেয়ের হাত ধরতে যাও কেন তবে?

এই জন্যে।—বলিয়া রাজকুমার মালতীর হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিল।

বিয়ে বাড়িতে সময়টা কাটিল ভালোই। বন্ধু ও পরিচিত অনেকে উপস্থিত ছিল। রাত দশটার মধ্যে লগ্ন, বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ রাজকুমার বিবাহ দেখিল। কনেকে সত্যই আশ্চর্যরকম সুন্দরী দেখাইতেছে। রং তার অত্যন্ত ফরসা, সাধারণ অবস্থায় দিনের বেলা লাবণ্যের অভাবে চোখে ভালো লাগে না, এখন ক্রিম, পাউডার, স্নো, চন্দন আর ঘামে স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়াছে মুখখানা। খুঁতগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে সাজানোর কায়দায় এবং খুঁতও মেয়েটির কম নয়। রাজকুমার অনাবশ্যক সহানুভূতি বোধ করে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে এ ভাবে সাজিয়া থাকিবার সুযোগ মেয়েটি পাইবে না। দুপাশে চাপা কপাল, নিভাঁজ চোখের কোণ, নাকের নীচে ভিতর দিকে মুখের অসমতল খাদ, চোয়ালের অসামঞ্জস্য, এ সব লোকের চোখে পড়িতে থাকিবে। তবে, ধীরেনের চোখে হয়তো পড়িবে না। ফরসা রঙে তার চোখে যে ধাঁধা লাগিয়াছে, সেটা আর কাটিবার নয়। বাড়ির বউয়ের রঙের গর্বে বাড়ির অন্য মানুষেরাও হয়তো তার রূপের অন্য সব ত্রুটির কথা তেমনভাবে মনে রাখিবে না।

মেয়েটি একটু বোকা এবং অহংকারী। মুখ দেখিয়া এটুকু বুঝা যায়। কাপড়ে পুঁটুলি করা দেহটি দেখিয়া অনুমান করা যায়, ভোঁতা, অনাড়ম্বর, নিষ্ক্রিয় প্রেমের সে উপযোগী। নীরবে অনেকটা নির্জীব পুতুলের মতো নিজেকে দান করার জন্য সে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; ধীরেনের যখন খুশি গ্রহণ করিবে যখন খুশি করিবে না, তার দিক হইতে

কখনও কোনো দাবি আসিবে না, কোনো সাড়া পাওয়া যাইবে না। স্বামীর সঙ্গে অন্তরালের জীবনটিও প্রথম হইতেই তার কাছে হইয়া থাকিবে প্রকাশ্য উঠা-বসা-চলা ফেরার মতোই বাঁচিয়া থাকার নিছক একটা অঙ্গ মাত্র, আবেগ ও রোমাঞ্চের বাড়াবাড়ি যাতে বিকারের সামিল। দাবি সে করিবে সুখ, সুবিধা ও অধিকার, কর্তৃত্ব সে করিবে অনেক বিষয়ে, সংসারে নিজের স্থানটি দখল করিতে কারও সাহায্যের তার দরকার হইবে না, তার হুকুমেই ধীরেন উঠিবে বসিবে। নিস্তেজ প্রাণহীন শুধু সে হইয়া থাকিবে স্বামীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কে।

মেয়েটির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু হয়তো স্পষ্টভাবে জানা যাইত, যদি—

মনের চোখে সে ভাবেই দেখিয়াছে। একটু বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে না, বিবাহের আসরে বন্ধুর কনেকে পর্যন্ত এ রকম অভদ্রভাবে কল্পনা করা? এদিকটা রাজকুমারের একবার খেয়ালও হয় নাই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টনীতে মেয়েটির জীবনে কী বৈশিষ্ট্য থাকিবে সেই অনুমানেই মশগুল হইয়া গিয়াছিল। কাপড় ঢাকা দেহ দেখিয়া কতটুকুই বা বুঝিতে পারা যায়? দশমিনিটের জন্য যদি ভগবান যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন ঠিক তেমনই অবস্থায় মেয়েটিকে সে দেখিতে পাইত! বন্ধুর দাম্পত্য জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ইতিহাস তার জানা হইয়া যাইত।

এগারোটার সময় সরসী কোথা হইতে আসিয়া বলিল, আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে চলো।

ওরা?

ওরা পরে যাবে—শ্যামলের সঙ্গে।

ওরা দেরি করছে কেন?

আড্ডা দিচ্ছে। এখনও খেতেও বসেনি।

তুমি খেয়েছ?

সন্দেশ মিষ্টি খেয়েছি, আমি নেমন্তন্ন খাই না।

এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মিল আছে। আমি অবশ্য ঘরোয়া নেমন্তন্ন খাই, তুমি বললে তোমার বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসব। ভোজ কখনও খাই না।

কিছু খেয়েছো তো?

কই আর খেলাম? দুবার ডাকতে এল, আমি বললাম, সকলের সঙ্গে বসব না। বাস্ কেউ আর টুঁ শব্দটি করল না।

তুমি বড়ো ছেলেমানুষ রাজু। বিয়ে বাড়ি, পাঁচ-সাতশো লোক খাবে, প্রত্যেকের বিষয়ে অমন করে খোঁজ খবর রাখতে পারে? বললে না কেন তোমায় কিছু এনে দিতে? আমি বসব না মশায়, আমায় একটা প্লেটে সামান্য কিছু এনে দিন, এ কথাটা আর মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

কথাটা ওদের বলাই উচিত ছিল না?

তোমরাই আবার মেয়েদের সেন্টিমেন্টাল বলো। সরসী হাসিয়া ফেলিল, আমি বলে দিচ্ছি, কিছু খেয়ে নাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

নিশ্চয়।

রাজকুমারকে খাবার দেওয়ার কথা বলিতে সরসী কিন্তু যায় না, খোঁপা ঠিক করার অবসরে কত কী যেন ভাবিয়া নেয়।

তার চেয়ে আমার বাড়ি গিয়ে খাবে চলো।

বাঁচালে সরসী। লক্ষ্মী মেয়ে। হাটে বসে খাবার গিলতে সত্যি আমার কষ্ট হয়, সেন্টিমেন্টাল বলো আর যাই বলো।

আমি কিন্তু এ সব হাটে বসে দশজনের সঙ্গেই খেতে ভালোবাসি, রাজু। তোমায় মিছে বলেছিলাম, আমি খুব নেমন্তন্ন খাই। তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব বলে না খেয়ে ওদের আগে চলে এসেছি।

বলো কী সরসী? আমায় তো সাবধান হতে হবে।

তুমি আবার অসাবধান কবে? বাস তো কর দুর্গে, সাবধান আবার হবে কী?

কীসের দুর্গ সরসী? কার দুর্গ?

তোমার নিজের দুর্গ। কীসের তা জানি না।

কথার কথা? কে জানে? বুঝিতে না পারিয়া রাজকুমার একটু বিরক্ত বোধ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিতেও বাধো বাধো ঠেকিতে লাগিল। সরসীর ইঙ্গিত তার জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝা উচিত।

সরসীদের বাড়ির সকলেই বিয়েবাড়িতে গিয়াছিল, কেবল কেদার সকাল সকাল ফিরিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। রাত তিনটায় কাশিতে কাশিতে তাঁর ঘুম ভাঙিবে, তার আগে ভদ্রলোকের আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

চাকর দরজা খুলিয়া দিয়া হুকুমের জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। সরসী বলিল, তুই শো গে যা লছমন।

একটু পুরানো ধাঁচের বড়ো চারকোনা বাড়ি, ঘরগুলি প্রকাণ্ড। নীচের হলটিতে রীতিমতো সভা বসানো চলে। এই হলে রাজকুমারকে বসাইয়া সরসী খুঁজিয়া পাতিয়া নানারকম খাবার আনিয়া হাজির করিল।

পেট ভরেই খাও। এখন একবার খেয়ে বাড়ি গিয়ে আর খাবার দরকার নেই।

পেট ভরে না খেলেও বাড়ি গিয়ে আর খেতাম না সরসী।

এখনও তোমার হজমের গোলমাল হয়?

সাবধান থাকলে হয় না।

খুব গুণের কথা হল, না? এই বয়সে বুড়োদের মতো খাওয়ার বিষয়ে সাবধান হয়ে চলতে হবে? তুমি একেবারে একসারসাইজ কর না। সারাদিন শুয়ে বসে ঘরের কোণে কাটালে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে?

সে জন্য খুব বেশি আসত যেত না সরসী। আসল কারণ হল, এককালে খুব এক্সারসাইজ করতাম, হঠাৎ ছেড়ে দিয়েছি। চিরকালের আলসে লোকের শুয়ে বসে থাকাটা দিব্যি সয়ে যায়, হঠাৎ একদিন আলসে হলেই বিপদ।

ছাড়লে কেন? আবার তো ধরতে পার?

ধরব। শিগগির ধরব। দু-চারদিনের মধ্যে।

অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে রাজকুমারের কথা বলার ধরনে সরসী একটু আশ্চর্য হইয়া যায়। সে যেন সরসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, দেহকে আর অবহেলা করিবে না, অবিলম্বে ব্যায়াম আরম্ভ করিবে। অপরাধের বিলম্বিত প্রায়শ্চিত্ত করার মতো। রাজকুমারের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সরসী আর কথা বলে না, নীরবে তাকে দেখিয়া যায়। সেটা বিস্ময়কর ঠেকে রাজকুমারের কাছে।

এবার বিদায় নেওয়া যাক।

বোসো।

সেটা কি উচিত হবে? রাত কম হয়নি।

তুমি আমাকে উচিত অনুচিত শেখাতে এসো না।

নিজেও সরসী বসে। বসার পর একসঙ্গে বেশিক্ষণ রাজকুমারের মুখখানা দেখিতে না পারায় এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বারবার তার মুখের দিকে তাকায়। রাজকুমার নীরবে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। সরসীর কিছু বলিবার আছে অনেক আগেই সে তা অনুমান করিয়াছিল। তার কাছে কিছু আশা করিয়া সরসী সুযোগ পাইয়া এত রাত্রে তাকে খালি বাড়িতে ডাকিয়া আনে নাই, সরসীর কাছে এসব হঠাৎ পাওয়া সুযোগ-সুবিধার কোনো মানে নাই। সে রকম ইচ্ছা থাকিলে কবে সকলে বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলে বাড়ি ফাঁকা হইবে সে ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া রাজকুমারকে দিয়াই হয়তো সে খালি একটা বাড়ি ভাড়া করার ব্যবস্থা করিত। কোনো কারণে তাকে আজ সরসীর দরকার হইয়াছে। খুব সম্ভব তাকে কিছু বলিবে সরসী এবং যতক্ষণ মুখ ফুটিয়া না বলিবে, কী যে সে বলিতে চায় কেউ কল্পনাও করিতে পারিবে না।

সরসীর প্রকৃতি আসলে খুব সহজ ও সরল। দরকারি নির্দোষ মিথ্যা সে অনর্গল বলিতে পারে, আজ সন্ধ্যায়ও অনায়াসে লাগসই কৈফিয়ত রচনা করিয়া নিজেকে সাক্ষী দাঁড় করাইয়া রুক্মিণীর কাছে তার লজ্জা বাঁচাইয়াছিল। বুদ্ধি তার ধারালো, মানুষের কাছে কাজ আদায় করার কোনো কৌশল বোধ হয় তার অজানা নাই, সস্তা আবেগ তার কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পায় না।

কাল থেকে তোমার কথাই ভাবছি রাজুদা।

কেন?

তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন।

কেমন হয়ে যাচ্ছি?

কী রকম অস্থির দিশেহারা হয়ে পড়ছ। বেঁচে থাকতেই তোমার যেন ভালো লাগছে না, সব সময় একটা কষ্ট ভোগ করছ। অনেকদিন থেকেই তোমার এ ভাবটা লক্ষ করছি। কী হয়েছে তোমার?

রাজকুমার নীরবে মাথা নাড়িল।

সরসী ভ্রু কুঁচকাইয়া একটু ভাবিল।—কী হয়েছে বুঝতে না পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু কিছু যে তোমার হয়েছে তাও কি বুঝতে পার না? অসুখ হলে তো সবসময় জানা যায় না কী অসুখ হয়েছে, শরীরটা শুধু খারাপ লাগে। নিজের ভেতরে সেই রকম কিছু বোধ কর না? অসুখের কথা বলছি না। মনে তোমার কোনো রকম অস্বস্তি আছে, টের পাও না?

এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন সরসী?

বললাম না তোমার জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে? রিণির কাছে সব শুনে—

তাই বলো।

তুমি যা ভাবছ, তা নয়। রিণির কাছে সব শুনে আমার ভাবনা হয়নি, তার অনেক আগে থেকে তোমার সাধারণ চালচলন কথাবার্তার ধরন দেখেই ভাবনা হয়েছে। তবে রিণির ব্যাপারটা না জানলে আমি হয়তো চুপ করে থাকতাম। মানুষের কত কী হয়, বিশেষ করে তোমার মতো যারা নিজের মনের মধ্যেই বেশি করে বাঁচে। তোমার ভেতরে কোনো একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটছে, আস্তে আস্তে আবার সামঞ্জস্য হয়ে যাবে মনে করেছিলাম। একবার ভেবেছিলাম, লভে পড়েছ বুঝি, ছেলেখেলা নয়, আসল লভ। তারপর দেখলাম, সে সব কিছু নয়।

কী করে জানলে সে সব কিছু নয়?

সে রোগের সিমটম আলাদা, আমরা চিনতে পারি। একটা মেয়েকে ভালোবাসার মানে জানো? সকলকে ভালোবাসা, জীবনকে ভালোবাসা, বেঁচে থাকতেই মজা লাগা। তুমি কাউকে ভালোবাসো না, নিজেকে পর্যন্ত নয়। সব সময় তুমি ছটফট করছ, কী করলে একটু স্বস্তি পাবে। সর্বস্ব হারিয়ে গেলে মানুষ যেমন পাগলের মতো খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, তুমিও ঠিক তেমনই ভাবে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছ। থিয়োরি? তুমি পাগল রাজুদা। দেহের গড়নের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতির সম্পর্ক কী তাই টেস্ট করার জন্য কেউ এ ভাবে ব্যাকুল হয়? তোমার আরও সিরিয়াস কিছু হয়েছে, এ শুধু তার একটা লক্ষণ। আমার কান্না পাচ্ছে বুঝতে পারছ?

সেটা সহজেই বুঝা যাইতেছিল। গলা ভারী হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছে। রাজকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, কেঁদো না সরসী। কান্না আমি সইতে পারি না।

কান্না পেলেই আমি কাঁদি না কি?

তাই তো তোমায় ভালোবাসি।

ভালোবাসো না, ছাই। পছন্দ কর। ভালোবাসলে তো বেঁচে যেতে।

রাজকুমার করুণভাবে একটু হাসিল। সরসীকে সে পছন্দ করে, স্নেহ করে, একটু ভয়ও করে। নিজের সম্বন্ধে এই স্পষ্ট ও সহজ কথাগুলি সরসী ছাড়া কারও কাছে সে শুনিতে পাইত না। অনেকদিন হইতেই সরসী জানে তার ভিতরে কিছু গোলমাল চলিতেছে। নিজের সম্বন্ধে নিজে সে কখনও এ ভাবে চিন্তা করে নাই। যখন এ বিষয়ে কিছু ভাবিয়াছে, স্থূল বাস্তব জগতের আপেক্ষিকতার মাপকাঠিতে বিচার করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছে, ব্যাপারখানা কী। নিজের সম্বন্ধে যত কেন জাগিয়াছে, তার সবগুলির জবাব খুঁজিয়াছে যে অভিধানে শুধু সাধারণ চলতি মানে পাওয়া যায়। মুদির হিসাবে যেন সুখ-দুঃখের হিসাব কষিয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ খুঁজিয়াছে মাটির উপরে। আরও যে অনেক উষ্ণ গহন স্তর আছে মাটির নীচেএ যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সরসী মনে পড়াইয়া দিয়াছে, গভীর কৃতজ্ঞতায় অনেকদিন পরে রাজকুমারের হৃদয়গ্রন্থিতে স্রাব হয় চোখের জলের মতো নোনতা সুস্বাদু রসের, শুকনো মন একটু ভিজিয়া ওঠে।

সরসী বলিল, এত বড়ো হলে বসতে ভালো লাগছে না। ওপরে যাবে?

চলো।

উপরে দুটি পাশাপাশি ঘর সরসীর, একটিতে সে বসে, অপরটিতে শোয়। মাঝখানে একটি দরজা আছে, ঘর দুটির ব্যবধান বজায় রাখিতে দরজাটি সে অধিকাংশ সময় বন্ধ করিয়া রাখে, সামনের বারান্দা ঘুরিয়া যাতায়াত করে এ-ঘর হইতে ও-ঘরে।

বসিবার ঘরে রাজকুমারকে বসাইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একপাশে একটি চারকোনা টেবিলে সরসী লেখাপড়া করে, তার সভা-সমিতির কাগজপত্রেই টেবিলের অর্ধেকটা ভরিয়া আছে। ছোটো একটি শেল্‌ফে বাছা বাছা বই, প্রত্যেকটি বই রাজকুমারের পড়া। নির্বিচারে ভালো-মন্দ সব বই পড়ার সময় সরসীর হয় না। রাজকুমারের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে, রাজকুমার নিজে পড়িয়া যে সব বই তাকে পড়িতে বলে শুধু সেই বইগুলিই সে পড়ে—তার জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তের বাহিরের বইগুলি ছাড়া। এ-ঘরে প্রায়ই অনেক মেয়ে জড়ো হয়, সোফা চেয়ারে ঘরটি একটু ঠাসিয়া ফেলিতে হইয়াছে। জানালার কাছে গেরুয়া আস্তরণ ঢাকা একটি ইজিচেয়ার, সরসী ওখানে বিশ্রাম করে। আস্তরণে মাথার চুলের দাগ পড়িয়াছে টের পাওয়া যায়। সারাদিন ছুটাছুটির পর ওখানে চিত হইয়া শ্রান্ত সরসী না জানি কী ভাবে! দশজনের সঙ্গে সরসীর কারবার, সর্বদা সে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, দু-চারজন সঙ্গিনী সারাদিন তার আছেই। সরসীকে এই ঘরে একা কল্পনা করিতে গিয়া রাজকুমারের মনে হয় সে যেন নিজেরই এক রহস্যময় ভাবপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতেছে।

সরসীর ফিরিতে দেরি হইতেছিল। এত রাত্রে তাকে একা বসাইয়া কী করিতেছে সরসী? আত্মসংবরণ করিতেছে? রাজকুমার নিজের কাছেই মাথা নাড়ে। যতই বিচলিত হোক সামলাইয়া উঠিতে সরসীর সময় লাগে না, নির্জনতার প্রয়োজন হয় না। নীচে তার

যখন কান্না আসিয়াছিল তখনও এক মিনিটের জন্য উঠিয়া গিয়া কাঁদিয়া অথবা কান্না থামাইয়া আসিতে হয় নাই।

রাজকুমার মৃদুস্বরে ডাকে, সরসী?

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় সরসীর গলা। নীচে অত সহজে যে কান্না সে আটকাইয়াছিল, ও ঘরে গিয়া সত্যসত্যই তবে কি সেই কান্নাই সে কাঁদিতেছে? রাজকুমার কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে। রিণির কাছে তার খাপছাড়া প্রস্তাবের বিবরণ শুনিয়া এমন আঘাত লাগিয়াছে সরসীর মনে? রিণিকে কথাটা বলার আগে সে শুধু ভাবিয়াছিল, এ সব কানে গেলে মালতী কত কষ্ট পাইবে। সরসীর কথা তার মনেও আসে নাই। শেষ পর্যন্ত আঘাতটা তবে পাইল সরসী?

রাজকুমার ভাবিয়াছিল, সরসী বাহির হইতে ঘরে আসিবে। শোয়ার ঘরের দরজা খোলার শব্দে সেদিকে চাহিয়া তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

সরসী আগাইয়া আসিল আরও কয়েক পা।

রিণির মতো রং নেই, আমি কালো। তবু ভাবলাম, তুমি তো রং দেখতে চাও না—

তুমি কাঁপছ সরসী।

মনের জোরে কুলোচ্ছে না। কী মনে হচ্ছে জানো? ছুটে গিয়ে খাটে তোষক গদির নীচে ঢুকে পড়ি। কিছু ভাবা আর করার মধ্যে কত তফাত। তখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি না ডাকলে দরজা খুলতেই পারতাম না।

তুমি বড়ো সুন্দর সরসী।

চুপ। ও সব বোলো না। দম আটকে মরে যাব।

মরবে না, শোনো। তোমার শরীর এমন সুন্দর বলে তোমার মনটাও সুন্দর। তোমায় এখন আমি প্রণাম করতে পারি। জানো?

অনির্বচনীয় আনন্দে রাজকুমারের চিত্ত ভরিয়া যায়, নিরবসন্ন সক্রিয় শান্তির মতো এক অপূর্ব অনুভূতি জাগে। শক্তি ও সহিষ্ণুতার যেন সীমা নাই। শ্রদ্ধা, মমতা, কৃতজ্ঞতা আর সহানুভূতি মেশানো যে মনোভাব সরসীর প্রতি জাগে, প্রেমের চেয়ে তা বোধ হয় কম জোরালো নয়। সরসী তাকে বোঝে, বিশ্বাস করে। ব্যাখ্যা করিয়া সরসীকে তার কিছু বুঝাইতে হয় নাই, রিণির কাছে তার বক্তব্যের ভাঙাচোরা বিকৃত বিবরণ শুনিয়া সে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছে তাই মনে করিয়াছে যথেষ্ট। আর জেরা করে নাই, তর্ক তোলে নাই, নিজের হইয়া ওকালতি করার যন্ত্রণা তাকে দেয় নাই, বিনা ভূমিকায় নিজের দেহটি তাকে দেখিতে দিয়াছে। সরসী ছাড়া আর কেউ তা পারিত না।

সরসীর মুখ বিবর্ণ হইয়াই ছিল, ধীরে ধীরে কখন আপনা হইতে তার চোখ বুজিয়া যায়, আর খোলে না।

এবার যাও সরসী।

তোমার কাজ হয়েছে? এসেছি যখন, মাঝখানে পালিয়ে গিয়ে লাভ হবে না। আর দু-তিন মিনিট কোনো রকমে সইতে পারব।

আর দরকার নেই।

· সরসী শোয়ার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু বুঝা যায় দরজার কাছেই সে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় দম নিতেছে।

এবার তুমি যাও রাজুদা। আজ আর তোমায় মুখ দেখাতে পারব না।

আচ্ছা।

লছমনকে ডেকে দিয়ে যেও।

আচ্ছা। সরসী?

না-না-না। বোলো না রাজুদা। রাস্তায় নেমে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

এতক্ষণ পরে তোমার ভয় হল সরসী? সামনে থেকে সরে গিয়ে? আমি অন্য কথা বলছিলাম।

কী কথা?

আমি কাউকে ভালোবাসি না।

সে তো আমিই তোমাকে বলেছি একটু আগে।

তুমি বললে কী হবে, আমি তো জানতাম না। আজ জানতে পেরেছি। তোমায় একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যাই। তোমার শরীর আর মন শুধু সুন্দর নয়, তুমি ভালো, তোমার বেঁচে থাকা সার্থক। তুমি আমাকে উঁচুতে তুলে দিয়েছ। তোমার সাহায্য না পেলে কোনোদিন হয়তো সেখানে উঠতে পারতাম না সরসী। তুমি আমার আর একটা উপকার করেছ সরসী। গিরির ব্যাপারটা জানো?

জানি।

ব্যাপারটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিন্তু শক্‌টা কোনোমতে কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। একটা জ্বালা বরাবর থেকে গিয়েছিল। তুমি আজ জ্বালাটা দূর করে দিলে। মনে মনে কতখানি কষ্ট পাচ্ছিলাম এতদিন ভালো বুঝতে পারিনি, এখন মন শান্ত হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি। কোনো মেয়ের সংস্পর্শে এলেই আপনা থেকে মনে হত, এও গিরির জাতের জীব, এর মধ্যেও নিশ্চয় খানিকটা গিরির উপাদান আছে তোমার সম্বন্ধে পর্যন্ত তাই মনে হত। যুক্তি দিয়ে বুঝতাম অন্য রকম, কিন্তু কিছুতে চিন্তাটা ঠেকাতে পারতাম না। তুমি আজ আমার বিকারটা কাটিয়ে দিয়েছ সরসী।

একটু দাঁড়াও রাজুদা, যেও না।

কয়েক মিনিট পরে সাধারণ একটি শাড়ি পরিয়া ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া সরসী এ ঘরে আসিল।

জোরে জোরে মাইল খানেক হেঁটে আসি চলো। আজ রাতে নইলে ঘুম আসবে না।

রাজকুমার ভাবে, কারও কাছে সে কি কোনোদিন কোনো অপরাধ করে নাই, পৃথিবী অথবা স্বর্গ অথবা নরকবাসী কারও কাছে?—যে অপরাধের অনুভূতি তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে, যার প্রতিক্রিয়া জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে কারও উপর একটু বিদ্বেষের জ্বালা অনুভব করিতে পারে?

রাগ নাই, অভিমান নাই। একটি মানুষের উপরেও নয়। জড়বস্তুকেও মানুষ কখনও কখনও হিংসা করে, হোঁচট লাগিলে অন্ধ ক্রোধে ইঁটের উপর পদাঘাত করে, কারাগারের লোহার শিক ভাঙিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু মানুষ নিষ্ক্রিয় নির্জীব পুতুল হইলে একটি পুতুলের মুখ তার পছন্দমতো নয় বলিয়া যতটুকু বিরক্তি বোধ করা চলিত, তাও সে বোধ করে না। মানুষের মনের অন্ধকার ও দেহের শ্রীহীনতার অপরাধ সে ক্ষমা করিয়াছে। মানুষ যে কৃপণ তাতে তার কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ, মানুষের কাছে সে কিছু চায় না।

এই নির্বিকার ঔদার্য যেন জীবনের সেরা সম্পদ, কুড়াইয়া পাইয়াছে। দূর হইতে দিনের পর দিন শুধু চাহিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একদিন ধনীর দুলালের খেলনাটি বস্তিবাসী শিশুর হাতে আসিলে সে যেমন আনন্দে পাগল হইয়া ভাবে, জীবনে তার পাওয়ার আর কিছুই বাকি নাই, আর্য শান্তি আহরণের সৌভাগ্যে বিপরীত আনন্দের উন্মাদনায় রাজকুমারেরও তেমনি মনে হইতে থাকে, এবার সে তৃপ্তি পাইয়াছে, সম্মুখে তার পরিতৃপ্ত জীবন।

সকলে জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে রাজু? ডার্বি জিতেছো?

একে জিতেছি।—রাজকুমার দেখাইয়া দেয় নিজেকে, কখনও বুকের ডাইনে কখনও বাঁয়ে আঙুল ঠেকাইয়া।

যে কাছে আসে সেই পরিবর্তন লক্ষ করে, নদীতে জোয়ার আসার মতো এত স্পষ্টভাবে সে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনোরমা বিস্মিত হয়, আশা করিবে কী হতাশ হইবে ভাবিয়া পায় না। আশাভঙ্গের ভয়টাই হয় বেশি। কালীর জন্য যদি বদলাইয়া গিয়া থাকে রাজকুমার, তাকে কিছু না বলিয়াই কি বদলাইত? এখন শুধু এইটুকু আশা করা চলে যে তাকে কিছু না বলিলেও কালীর সঙ্গে হয়তো তার কোনো কথা হইয়াছে, হয়তো অন্য কিছু ঘটিয়াছে। অন্য কিছু কী আর ঘটিবে, হয়তো কালীকে একটু আদর করিয়াছে রাজকুমার এবং কী করিবে না করিবে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়া সুখী হইয়াছে। এবার সময়মতো একদিন তার কাছে কথাটা পাড়িবে।

মনে মনে মনোরমা কিন্তু মাথা নাড়ে। রাজকুমারের খুশি হওয়া যেন সে রকম নয়। সে শান্তই ছিল চিরদিন, আরও শান্ত হইয়াছে, শুধু চোখেমুখে ফুটিয়াছে জ্যোতি, কথা ও ব্যবহার হইয়াছে নির্ভয় নিশ্চিন্ত সুখী মানুষের আনন্দময় সহজ আত্মপ্রকাশ। একটু তো উত্তেজনা থাকা উচিত ছিল আনন্দে, কালীকে চায় কি চায় না এ সমস্যার মীমাংসা যদি তার হইয়া গিয়া থাকে, শুরু যদি হইয়া থাকে কালীকে পাওয়ার দিন গোনা? কালীকে সে

জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে কালী, কী হয়েছে রে?

জিজ্ঞাসা করে অনেক বুদ্ধি খাটানো খানিকটা ভূমিকার পর। সে আর কালী ছাড়া রান্নাঘরে কেউ নাই, তবু হাত ধুইতে ধুইতে কালীকে সে শোয়ার ঘরে যাইতে বলে, একটা কথা আছে। একটু দেরি করিয়া নিজে ঘরে যায়, দরজা সযত্নে ভেজাইয়া দেয়। তারপর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সুখবর প্রত্যাশা করার মতো ব্যগ্রভাবে প্রশ্নটা করে। যদি কিছু ঘটিয়া থাকে কালীর মতো বোকা মেয়েরও বুঝিতে বাকি থাকিবে না কোন বিষয়ে তার জানিবার আগ্রহ। মুখে কিছু না বলুক, কালীর মুখ দেখিয়াই সে সব বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু হায়, কালীর মুখে বিস্ময় ছাড়া আর কোনো ভাব ফোটে না।

কীসের দিদি?

হতাশ ক্রোধে মনোরমা বলে, কচি খুকি, তুমি কিছু জান না। রাজু তোকে কিছু বলেনি? কিছু করেনি?

না তো?

না তো? বড়ো গর্বের কথা তোর, না? যা চেহারা, যা স্বভাব, কে তোকে পছন্দ করবে।

রাজকুমার আজকাল সকলের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। চেষ্টা না করিয়া কেউ আজকাল রাজকুমারকে কাছে পায় না। কাছে মানে পাশে বা সামনে নয়। সে ভাবে কারও কাছ হইতে রাজকুমার নিজেকে দূরে সরাইয়া নেয় নাই। দেখা-সাক্ষাৎ সকলের সঙ্গে যেমন চলিতেছিল প্রায় সেই রকমই বজায় আছে। যাদের সঙ্গে শুধু বাহিরের পরিচয় তারা বরং এমন কথা ভাবে যে আরেকবারের আলাপে মানুষটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই বুঝি খানিকটা বাড়িয়া গেল। কিন্তু যাদের সঙ্গে তার পরিচয় ভূমিকা পার হইয়া জীবনের আনুষঙ্গিক দৃশ্যপট জানাজানিতে অন্তত পৌঁছিয়াছে, যারা উচ্চারণ করার আগেই তার দুচারটি মনের কথা এতকাল টের পাইয়া আসিয়াছে, চেষ্টা না করিলে তারাও আর মনের তার নাগাল পায় না, ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি তুচ্ছ একটি কথারও পুনরাবৃত্তি যেন হয় না কারও সঙ্গে তার দুচার ঘন্টার আলাপে।

তিনদিন তার সঙ্গে মালতীর দেখা হইয়াছে, দশজনের মধ্যে এবং নির্জনে। তিনদিন নিজের মধ্যে নিজেকে নিয়া মশগুল মানুষটাকে মালতী দেখিয়াছে, কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারে নাই।

প্রথমেই এই চিন্তা তার মনে আসিয়াছিল, একি শ্যামলের জন্য? শ্যামল আর তার সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া কি রাজকুমার হঠাৎ এভাবে বদলাইয়া গিয়াছে? রাজকুমারের পরিবর্তনের কত সম্ভবপর কারণেই কথাই সে ভাবিতে পারিত, কত রাগ আর অভিমান জাগিতে পারিত উপেক্ষার মতো রাজকুমারের নির্বিকার খাপছাড়া ব্যবহারে, তার বদলে শ্যামলকে কারণ হিসাবে মনে টানিয়া আনিয়া বুকটা তার ধড়াস করিয়া উঠিল। সত্যই

যেন শ্যামলের সঙ্গে তার কিছু হইয়াছে, শ্যামল যেন নিছক তার বন্ধু নয়। শ্যামলের দিক হইতে ধরিলে হয়েতো সে তা নয়। হয়তো কেন, মালতী ভালোভাবেই জানে শ্যামলের মনকে বন্ধুর মন বলিয়া গণ্য করা শুধু ভুল নয়, নিষ্ঠুর অন্যায়। মাঝে মাঝে শ্যামলের জন্য আজকাল জ্বালা করিয়া চোখে তার জল আসে, আজ অপমান করিলেও কাল সে বই ফেরত নেওয়ার ছলে গম্ভীর মুখে বাড়িতে আসে, বই হাতে পাওয়া মাত্র চোখ, তার ক্রুদ্ধ করুণ ছলছল আশ্চর্য চোখ, আড়াল করিতে অভিমানী শিশুর মতো মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া গটগট করিয়া চলিয়া যাওয়ার উপক্রম করে, কিন্তু ডাকিবামাত্র ফিরিয়া আসিয়া বলে, কী বলছ শিগগির বলো, আমার কাজ আছে। তবে এটা শুধু শ্যামলের দিক। সে তো কোনোদিন তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, কাছে আসিতে আর কথা বলিতে দেওয়া যদি প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। রাজকুমারের ভাবান্তর তার আর শ্যামলের সম্পর্কেরই কোনো জটিল দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়া, প্রথমেই এ কল্পনা কেন তাকে চমকাইয়া দেয়? তারপর সারাদিন উতলা করিয়া রাখে, নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করায়? কদিন মালতী যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে দারুণ কিন্তু সে যেন কেমন এক ধরনের যন্ত্রণা, উদভ্রান্ত উত্তেজনা আর আত্মহারা অবসাদের বেদনাহীন পীড়ন, গা পোড়ানো জ্বরে হাড় কাঁপানো শীতের মতো।

আজ শ্যামল আসিবে। কাল মালতী নিজে তাকে আসিতে বলিয়াছে। শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে। বাহিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হওয়ার কথা সে ভাবিতেছে, হঠাৎ তার মনে হইল, এভাবে চলিতে পারে না, এ ভাবে রাজকুমারকে দূরে সরিয়া যাইতে দেওয়া অন্যায়, তারও অন্যায়, রাজকুমারেরও অন্যায়। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া শুধু উতলা হইলে তার চলিবে না। আজ রাজকুমারকে তার কাছে পাওয়া চাই। শ্যামল যখন আসিল, রাজকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়া মালতী সবে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াছে।

উৎসাহে শ্যামল অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল । শিগগির তৈরি হয়ে নাও মালতী, দেরি হয়ে গেছে।

আমি যাব না।

কেন? লক্ষ্মী চলো। প্লিজ।

কী অশ্চর্য, বলছি তোমার সঙ্গে যাব না, রাজুদার সঙ্গে আমার দরকার আছে, জোর করে নিয়ে যাবে তুমি আমায়?

জোর করে?

আমি তো কিছুই করিনি মালতী?

করোনি? দিনরাত পেছনে লেগে আছ তুমি আমার, কিছু করোনি? এই যে তাকিয়ে আছ অমন করে, এটা কিছু করা নয়, এই যে তর্ক করছ, এটাও কিছু করা নয়— তুমি কিছুই করো না, বড়ো ভালো ছেলে তুমি। যেতে বলছি, চলে যাও না? তোমাব কি মানঅপমান জ্ঞান নেই? এত অপমান করি, কিছুতেই তোমার অপমান হয় না?

তুমি আমায় কখনও অপমান করোনি।

করিনি? হাজারবার করেছি। অন্য কেউ হলে—

রাগের মাথায় কখনও দু চারটে কথা বলেছ, তাকে অপমান বলে না আসতে বারণ করে নিজেই আবার আসতে বলেছ।

আমি আসতে বলেছি? ছুতো করে তুমি নিজে এসেছো।

ছুতোগুলি তুমি মেনে নাওনি কেন? বই নিতে এসেছি, বই নিয়ে চলে যেতে দিলেই চুকে যেত। দু-চার দিনের বেশি তো আর ছুতো করে আসতে পারতাম না, আপনা থেকে আমার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। মালতীর সঙ্গে কলহ বাধিলে চিরদিন শ্যামলের কথা জড়াইয়া গিয়াছে, আজ তাকে চাপা গলায় ধীরে ধীরে অপরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলিতে শুনিয়া মালতীর হঠাৎ কেমন ভয় করিতে লাগিল। শ্যামল ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে। রাগে সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তবু সে এত আস্তে এত স্পষ্টভাবে কথা বলিতেছে কী করিয়া?

যাকগে। ও সব কথা থাক শ্যামল।

না, থাকবে না।

মালতী ভীরু চোখ তুলিয়া শ্যামলের মুখের দিকে তাকায়। শ্যামলের চোখে কী হইয়াছে—অমন করিয়া তার দিকে সে তাকায় কেন?

রাজকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর শ্যামলের সম্পর্কে মালতীর মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। নিজে সে যাচিয়া রাজকুমারকে জানাইয়া দিয়াছিল, শ্যামলের সঙ্গে তার সিনেমায় যাওয়ার কথা আছে, শ্যামল এখনই তাকে নিতে আসিবে, কিন্তু রাজকুমারের সঙ্গে সে আজ সন্ধ্যাটা কাটাইতে চায়। ভাবিয়াছিল, শ্যামলকে বাতিল করিয়া তার সঙ্গ চায় শুনিয়া রাজকুমার নিশ্চয় খুশি হইবে। খুশি সে হইয়াছিল কিনা ভগবান জানেন, শ্যামলের সঙ্গেই সিনেমায় যাওয়ার জন্য তাকে রাজি করাইতে কত চেষ্টাই যে রাজকুমার করিয়াছিল। শ্যামলের মনে নাকি কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, শ্যামল তাকে ভালোবাসে। শেষে রাজকুমার বলিয়াছিল, ওকে অন্তত মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে দিও মালতী, মনে যেন দুঃখ না পায়। আমার কাছে আসছ ওকে জানিয়ে দরকার নেই। ওর সম্বন্ধে আমার ভয় আছে মালতী, মাথাপাগলা ছেলে তো, কখন কী করে বসে। তার সঙ্গে সন্ধ্যাযাপনের জন্য রাজকুমারকে রাজি করাইতে রীতিমতো চেষ্টা করিতে হওয়ায় মালতীর গা জ্বালা করিতেছিল, এ সব কথা শুনিতে শুনিতে তার মনে হইয়াছিল শ্যামলের চেয়ে বড়ো শত্রু বুঝি তার নাই। হয়তো ঈর্ষাতে নয়, শ্যামলের মনে কষ্ট দেওয়ার ভয়েই রাজকুমার তাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাকে উপেক্ষা করিতেছে। শ্যামল রাজকুমারের পরিবর্তনের কারণ। তাকে ভালোবাসিয়া শ্যামল তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে।

মিষ্টি কথার বদলে অতি কড়া ভাষাতেই শ্যামলের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া সে তাই বাতিল করিয়া দিয়াছে। রাজকুমারের সঙ্গে তার দরকার আছে এ কথাটা জানাইয়া দিতেও

কসুর করে নাই। এখন শ্যামলের রকম দেখিয়া তার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে লাগিল। এতক্ষণ বিশ্বাস করে নাই, এবার মনে হইতে লাগিল রাজকুমার হয়তো ঠিক বলিয়াছে, শ্যামল ভয়ানক কিছু করিয়া বসিতে পারে।

শ্যামল বলিতে থাকে, তুমি হয়তো সত্যি আমায় অপমান করেছ, বাঁদর নাচিয়েছ, আজ তাড়িয়ে দিয়ে কাল আবার ডেকে পাঠিয়ে পোষা কুকুরের মতো খেলা করেছ আমার সঙ্গে। করে থাকলে বেশ করেছ। আমি বোকা, বোকাই থাকতে চাই, আমার যা ইচ্ছা তাই আমি বিশ্বাস করব। তবে তোমাকে আর জ্বালাতন করব না মালতী, প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি আর টেরও পাবে না শ্যামল বলে কেউ এ জগতে আছে। সত্যি বলছি মালতী, কাল থেকে তুমি ধরে নিতে পারবে, আমি বেঁচে নেই।

তার মনে? এসব কী বলছ? কী করবে তুমি? শক্ত করিয়া শ্যামলের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত চোখে তার পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মালতী শিহরিয়া উঠিল, এই সব উদ্ভট মতলব জাগছে তোমার মাথায়। আমি আগেই জানতাম তুমি একটা ভীষণ কাণ্ড না করে থামবে না। তোমার মতো যারা ছেলেমানুষ হয় চিরকাল তারাই লেকে ডুবে, সায়ানাইড খেয়ে জগতের ওপর শোধ নেয়—তোমার মতো যারা ভীরু আর কাপুরুষ।

আরও জোরে মালতী শ্যামলের হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, ছাড়িয়া দিলেই সে যেন সঙ্গে সঙ্গে লেকে গিয়া ডুব দিবে অথবা কলেজের ল্যাবরেটরিতে গিয়া সায়ানাইড গিলিবে, তোমায় একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। এই যে মতলব তুমি করেছ—আগে শুনে নাও আমার কথা—এর মানে তো এই যে আমি অন্যের হয়ে যাব, তুমি তা সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারবে না? আমার জন্যেই মরবে তো তুমি? কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখছ, আমাকেও তুমি কী ভাবে মেরে রেখে যাবে, এক মুহূর্তের জন্য আমি শান্তি পাব না? আমি কী করে বাঁচব বল তো? আমায় ভালোবাস বলে তোমায় মরতে হবে—আমাকে শাস্তি দিয়ে। একে ভালোবাসা বলে নাকি? আমায় পেলে না বলে মরতে পারবে, আমার সুখের জন্য বেঁচে থাকার কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না।

শ্যামল মৃদুস্বরে বলিয়াছিল, তা বলিনি মালতী। সায়ানাইড খাওয়ার কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, আর তোমায় জ্বালাতন করব না, দূরে সরে যাব।

শুধু দূরে সরে যাবে?

হ্যাঁ, তোমায় আর বিরক্ত করব না।

ও।

মালতী নিশ্চিন্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মুখ দেখিয়া কিন্তু মনে হইয়াছিল সে যেন আহত হইয়াছে, অপমানও বোধ করিয়াছে। যাকে ছেলেমানুষ মনে করিয়া রাখা যায় তার কাছে ছেলেমানুষি করিয়া ফেলার লজ্জায় রাগও কি কম হয় মানুষের।

আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না মালতী।

মালতী চুপ করিয়াছিল। শ্যামল তাকে বুঝিতে পারে না, রাজকুমার তাকে বুঝিতে পারে না, সে নারী সে রহস্যময়ী! শ্যামল তাকে পূজা করে, রাজকুমার তাকে অবজ্ঞা করে, কারণ সে নারী, সে রহস্যময়ী, তাকে কেউ বুঝিতে পারে না!

আমার একটা কথা রাখবে মালতী?

অত ভূমিকা কোরো না। কী কথা?

একমাস বাইরে কোথাও ঘুরে আসবে?

তোমার সঙ্গে ?

না। তুমি একা। কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছে চলে যাও। পুনায় তোমার মাসিমার কাছে অনায়াসে যেতে পার। যাবে?

তখন মালতীর মনে হইয়াছিল, শ্যামল যেন আর ছেলেমানুষ নাই, ছোটো ছোটো আবেগে নিজেকে সে খরচ করিয়া ফেলে না, কখন সে যেন পরিণত পুরুষ হইয়া গিয়াছে, ধীর সংযত আত্মপ্রতিষ্ঠ তেজি পুরুষ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পুরুষ, হাসি কান্না আনন্দ বিষাদের রসজ্ঞ পাকা অভিনেতা। ঠিক কী অনুভূতি তখন তার জাগিয়াছিল আর আনুষঙ্গিক আরও কী সব কথা মনে হইয়াছিল পরে মালতী কোনোদিন স্মরণ করিতে পারে নাই। ওই কয়েক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা শুধু তার মনে ছিল, নতুন চিন্তা আর অনুভূতির যেটা ফলাফল পরবর্তী প্রক্রিয়া। সে অভিজ্ঞতা বড়ো অদ্ভুত। শ্যামল নিষ্ঠুর, রাজকুমারের চেয়ে নিষ্ঠুর। রাজকুমার কি নিষ্ঠুর? যাকে আপন করিতে চাই সে ব্যথা দিবেই, প্রিয় নিষ্ঠুর হইবেই—কারণ জগতে কেউ আপন হয় না, কেউ প্রিয় থাকে না চব্বিশ ঘন্টা। একদিন রাজকুমার যখন শুধু তার চোখে চোখে চাহিয়াছিল, পলক না ফেলিয়া যতক্ষণ চাহিয়া থাকিবার ক্ষমতা মানুষের আছে ঠিক ততক্ষণ, মালতীর আর্তনাদ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। এ সহজ সুবোধ্য কথা। কোলের শিশুকেও তো মার মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু গুরুজনের মতো তাকে শহর ছাড়িয়া দূরে কোথাও গিয়া থাকিতে উপদেশ দেওয়ার সময় শ্যামলকে দেখিবার কয়েকটি মুহূর্তে এ কী অভিজ্ঞতা তার জন্মিয়া গেল যে রাজকুমারের চেয়ে শ্যামলের নিষ্ঠুরতা গভীর ও মর্মান্তিক? তার আঙুলে গোলাপের কাঁটা ফুটিলে যে শ্যামলের মনে হয়তো লক্ষ কাঁটা ফোঁটার যন্ত্রণা হয়?

আমার ভালোর জন্য বলছ, তোমার কোনো স্বার্থ নেই, কেমন?

এবার শ্যামল চুপ করিয়া ছিল।

তুমি যাও শ্যামল। আমি বেরুব।

আমার সঙ্গেই চলো?

তোমার সঙ্গে যাব না।

কখন ফিরবে?

তুমি আমায় পাগল করে দেবে। যেতে বলছি, যাও না?

যাচ্ছি মালতী।

যাচ্ছি বলিয়াও শ্যামল মিনিট দুই দাঁড়াইয়াছিল।

আর আসব না তো?

তার মানে?

তুমি যদি সত্যি বারণ কর, তা হলে আর আসব না।

মালতী হতাশভাবে এতক্ষণ পরে বসিয়া পড়িয়াছিল।

তোমার সঙ্গে সত্যি পারলাম না শ্যামল। কী যে করি তোমাকে নিয়ে আমি। আমি জানি তুমি একটা ছুতো খুঁজছ, নাটক করার মতো খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে আসতে বারণ করব, তুমিও আমার হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে চলে যাবে, আর আসবে না। প্রথমদিন ভাববে আমি রক্তমাংসের মানুষ নই, পরদিন ভাববে আমি মাটি, পরদিন পাথর, পরদিন লোহা, পরদিন ইস্পাত— বেশ মজা হবে, না? সব ব্যাপারকে একেবারে চরমে না তুললে কি তোমার চলে না? তুমি জানো, ও ভাবে তোমাকে আমি যেতে বলতে পারি না। তুমি বোধ হয় ভাবো যে মেয়েরা যার সঙ্গে লভে পড়ে তাকে ছাড়া সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়?

আর কিছু বলতে হবে না মালতী। আমি যাচ্ছি।

শোনো, তোমাকে কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলা দরকার। আজ আমার সময় নেই, ক্ষমতাও নেই। কাল সন্ধ্যার পর একবার এসো।

আমাকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না, মালতী।

হবে। সব কথায় কথা বাড়াও কেন? কাল এসো।

না এলে তুমি দুঃখিত হবে?

শ্যামল! ফের যদি তুমি আমার সঙ্গে এমনি করো কোনোদিন তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

তারপর শ্যামল চলিয়া গেলে এমন শ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর অসহায় মনে হইয়াছিল নিজেকে, আধঘন্টা মালতী চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। এখন আবার রাজকুমারের সঙ্গে বুঝাপড়া বাকি আছে। শেষ (বুঝাপড়া সে আজ করিবে রাজকুমারের সঙ্গে) বুঝাপড়ার কী আছে, কিছুই সে জানে না। কিন্তু আর তার সহ্য হয় না। এই অনির্দিষ্ট অসহ্য-হওয়ার প্রতিকার চাই। এ ভাবে আর চলে না, চলিতে পারে না। হয় রাজকুমার তাকে লইয়া যাক সমুদ্রতীরের কোনো বন্দরে, পাহাড়ের মাথায় কোনো শহরে, মাঠের ধারের কোনো গ্রামে, সেখানে সন্ধ্যা হইতে তাকে বুকে তুলিয়া এত জোরে পিষিতে থাক যেন শেষ রাত্রে তার দম আটকাইয়া যায়, নয়তো তাকেই অনুরোধ করুক জোরে তার গলা জড়াইয়া ধরিতে যাতে আর রাজকুমার নিশ্বাস নিতে না পারে। তার দুর্বোধ্য অর্থহীন যন্ত্রণার মতো এইরকম খাপছাড়া ভয়ানক কিছু ঘটুক।

রাজকুমার প্রতীক্ষা করিয়া আছে, সে যাচিয়া দেখা করিতে চাহিয়াছে বলিয়া রাজকুমার তার জন্য রাস্তার ধারে একটা বিলাতি দোকানের লাল বাড়ির সামনে গাড়ি-

বারান্দার নীচে ফুটপাতে দাঁড়াইয়া তার প্রতীক্ষা করিতেছে, ক্রমাগত এই কথাটা মনে পড়িতে পড়িতে মালতীর মস্তিষ্কে উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার পাক-খাওয়া কমিয়া আসিল। জীবনে মালতী একবার নাগরদোলায় চড়িয়াছিল, দশ এগারো বছর বয়সে। তার দুর্দশা পৌঁছিয়াছিল সেই সীমায় যার পরেই মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। উঠিয়া জামাকাপড় বদলানোর সময় আজ তার মনে হইতে লাগিল, এই মাত্র সে যেন নাগরদোলা হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সে জানিত না, সম্প্রতি রাজকুমারেরও একদিন এই রকম মনে হইয়াছিল।

রাজকুমার বলিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছিলাম মালতী, দেখতে দেখতে একটা অন্যায় করে ফেলেছি।

সে কী?

এদিক থেকে একজন মহিলা আসছিলেন, সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়া যাবেন। সখন কাছাকাছি এলেন, আমি বুঝতে পারলাম তিনি আশা করছেন আমি একটু পিছু হটে তাঁকে পাশ কাটাবার অরেকটু জায়গা দেব। ভদ্রতা করে এক পা পিছু হটতে গিয়ে অরেকজনের পা মাড়িয়ে দিলাম, ছোটোখাটো একটু ধাক্কাও লাগল। যার পা মাড়িয়ে দিলাম তিনি ঠিক মহিলা নন, কমবয়সি একটি বিদেশি মেয়ে।

তারপর?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝলাম অন্তত গালে একটা চড় সে মারবেই। আমি অ্যাপলজি পর্যন্ত চাইলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কুড়ি কি বাইশ সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে চলতে আরম্ভ করল, কী বলে গেল জানো? সরি।

তারপর?

তারপর আবার কি?

তোমার চোখের দিকে কুড়ি-বাইশ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকেই মেয়েটার রাগ জল হয়ে গেল কেন বুঝিয়ে বলবে না? ওটাই তো আসল কথা, গল্পের মরাল। আচ্ছা আমিই বলছি শোনো। ভুল হলে করেক্ট করবে। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষ ভালো, মানুষ কখনও অন্যায় করে না, সমস্ত অন্যায় আপনি ঘটে যায়— ওগুলি জীবনের অ্যাক্‌সিডেন্ট। ঠিক হয়নি?

মালতী আজ রাজকুমারকে খোঁচা দিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে। মালতীর পক্ষে এটা একেবারে অসম্ভব বলিয়া জানিত কিনা রাজকুমার, তাই অনেকদিন পরে আজ ভালো করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—মুখের ভাব না দেখিয়া কোনো কথার মানে বুঝা যায় না অনেক সময়। শহরের শৌখিন প্রান্তর ডিঙাইয়া শেষ বেলার রোদ তাদের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাপের চেয়ে সে রোদের রং বেশি। মালতীর বিবর্ণ মুখে সত্যই তার কথার ব্যাখ্যা ছিল। তবু রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেছে?

না। অসুখ করেনি।

বাড়িতে না ডেকে এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে বললে কেন মালতী?

বাড়ির বাইরে তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল তাই। হয় নিজের বাড়িতে নয় অন্য কারও বাড়িতে তোমার সঙ্গে এতদিন কথা বলেছি। আমায় একদিন সিনেমায় পর্যন্ত তুমি নিয়ে যাওনি আজ পর্যন্ত।

রাজকুমার একটু ভাবিল।

সাড়ে ছটার সময় স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। পিওন দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এমন করে লিখেছেন দেখা করার জন্য, একটা কিছু গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে। স্যার কে এল-কে ফোন করে দি, সাড়ে নটার সময় বাড়ি গিয়ে দেখা করব। তারপর সিনেমায় যাবে তো চলো।

না। আগে দেখা করে হাঙ্গামা চুকিয়ে এসো।

তুমি এতক্ষণ কী করবে?

আমি? এক কাজ করা যাক, হোটেলে একটা রুম নাও। তুমি স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, আমি বিশ্রাম করব—শুয়ে থাকব একটু।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, মালতী।

ছেলেমানুষ নই?

আগে ছিলে, এখন কি আর তোমায় ছেলেমানুষ বলা যায়? তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ মালতী। আজ থেকে তুমি সুখী হবে।

শুনিয়া মালতীর ভয় করিতে থাকে। সুখ-দুঃখের কথা সে কখনও ভাবে নাই। সুখে অথবা দুঃখে কোনোদিন তার সচেতন হইতে খেয়াল থাকে নাই আমি সুখী অথবা আমি দুঃখী। নিজের সম্বন্ধে নিজের বিচারে এই হিসাবটা তার চিরদিন বাদ পড়িয়াছে। একটা অজানা মধ্যবিত্ত ফিরিঙ্গি হোটেলের একটা ঘরে তাকে রাখিয়া রাজকুমার স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়া গেলে নিজেকে মালতীর বড়ো অসহায় মনে হইতে থাকে। অপরিচিত আবেষ্টনীতে নিজেকে একা মনে করিয়া নয়, বাঁচিয়া থাকার মতো সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারটা হঠাৎ অতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া। তার নিজের একটা জীবন আছে, জীবন যাপনের কঠিন আর জটিল কর্তব্য তাকে পালন করিতে হইবে, কিন্তু সে কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। তার বুদ্ধি নাই, সাহস নাই, অভিজ্ঞতা নাই। রাজকুমার যাই বলুক, সে সত্যই ছেলেমানুষ, এতকাল শুধু ছেলেখেলা করিয়াছে, ছেলেখেলা করা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা তার নেই। জীবন তো ছেলেখেলার ব্যাপার নয়।

হোটেলটি বড়ো রাস্তা হইতে খানিকটা তফাতে, পথের শব্দ কানে আসে না। হোটেলটিও ছোটো এবং প্রায় নিঃশব্দ। হোটেলের লোক খাটে দুজনের বিছানায় ফরসা চাদর পাতিয়া, পাশাপাশি দুটি করিয়া বালিশ রাখিয়া গিয়াছে। ছোটো গোল চায়ের টেবিলটার দুদিকে দুখানা চেয়ার। চারটি বড়ো বড়ো জানালায় এমন কৌশলে পর্দা দেওয়া যে ঘরের মধ্যে আলো আসে কিন্তু মানুষের দৃষ্টি আসে না। দেওয়াল যেন সবুজ রঙে

গম্ভীর হইয়া আছে। ড্রেসিংটেবিলে প্রসাধনের আয়োজনের অভাব মালতীর অসম্পূর্ণতার অনুভূতিকে জোরালো করিয়া তোলে। আয়নায় যে মালতীকে দেখা যায় তাকে মালতীর মনে হয় অন্য একটি মেয়ে।

শেষ মুহূর্তে রাজকুমার মালতীকে একা রাখিয়া স্যার কে এল-এর সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার ব্যবস্থাটা বাতিল করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, মালতী রাজি হয় নাই।

না, সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দিয়ে এসো। আমার সঙ্গে কথা বলবে আর মনে মনে ভাববে রিণির বাবা কী জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার তা সইবে না।

তা ভাবব না মালতী। ওটুকু মনের জোর আমার আছে।

মনের জোরের কথা নয়।

রাজকুমার চলিয়া যাওয়ার পর আধঘন্টার মধ্যে মালতী অস্থির হইয়া উঠিল। সময় যে এত শ্লথ, শুইয়া বসিয়া ঘরের মধ্যে পাক দিয়া আর ক্রমাগত কবজিতে বাঁধা ঘড়িটির দিকে চাহিয়া সময়কে যে কিছুতেই তাড়াতাড়ি পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যায় না, আজ যেন সে তা জানিতে পারিল প্রথম। অথচ মনে মনে সে কামনা করিতে লাগিল, রাজকুমারের ফিরিতে যেন দেরি হয়। অনেক দেরি হয়।

ফিরিয়া আসিতে রাজকুমারের সত্যই দেরি হইয়া গেল।

স্যার কে এল-এর আপিস বেশি দূরে নয়, ট্যাক্সিতে পৌঁছিতে রাজকুমারের পাঁচ সাত মিনিটের বেশি সময় লাগিল না। আপিসের লোকজন অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে, কেবল তিনজন কেরানি তখনও ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিতেছে। নিজের ঘরে স্যার কে এল পাইপ কামড়াইয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন আর ঘরের কোণে টাইপরাইটারের সামনে চুপচাপ বসিয়াছিল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে। বয়স তার রিণির চেয়ে হয় তো বেশি নয়, কিন্তু মুখে অনেক বেশি বয়সের ছাপ।

বসো রাজু।

স্যার কে এল নিজেই বসিলেন।

তুমি এখনও যাওনি যে মিস রেড্‌ল?

স্যার কে এল নিজেই তাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, মনে ছিল না। মিস রেড্‌ল চলিয়া গেলে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন, একটা চিঠি টাইপ করাব বলে ওয়েট করতে বলেছি, এক ঘন্টার বেশি চুপচাপ ওয়েট করছে। একবার যে মনে করিয়ে দেবে সেটুকু সাহস নেই। খাঁটি ইংরেজ মেয়ে হলে, ইংরেজ কেন, বাঙালি মেয়ে হলে, কখন খেয়াল করিয়ে দিত, চিঠিটাও টাইপ করানো হত আমার। যাকগে।

মুখে যাকগে বলিলেও বাজে চিন্তাগুলিকে যাইতে দিয়া সহজে কাজের কথা কিন্তু তিনি আরম্ভ করিতে পারেন না। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করেন তার এক দুঃসাহসী টাইপিস্টের কথা, মাসের শেষে যে ওভারটাইম চার্জ করিয়া

তার কাছে বিল পাঠাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবশ্য বিদায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু সেটা তার দুঃসাহসের জন্য নয়।

নিজের পাওনা বুঝে নেবার সাহস সকলের থাকবে, আমি তাই পছন্দ করি রাজু। তুমি তো জানো আমাকে, জানো না? আমার প্রিন্সিপল্ হল, কারও ওপর অন্যায় না করা। তাই বলে অভদ্রতাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আমি তাকে আপিস টাইমের পর থাকতে হুকুম দিইনি, অনুরোধ করেছিলাম। একেবারে বিল না পাঠিয়ে সেও যদি আমাকে— যাকগে।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে ব্যাপার সহজ নয়। এতক্ষণ স্যার কে এল শুধু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, দরকারি চিঠি টাইপ করানোর জন্য টাইপিস্ট বসাইয়া রাখিয়া তার উপস্থিতি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাকে দেখিয়া এখন ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রাণপণে সেটা দমন করার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেকে একটু আয়ত্তে না আনিয়া আলোচনা আরম্ভ করিবার সাহস তার হইতেছে না। তাকে এমন কী বলার থাকিতে পারে রিণির বাবার যা বলা তার পক্ষে এত কঠিন? রিণির মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে স্যার কে এল-এর পরিচয়, ইদানিং কেবল সে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, বয়স হইতে শুরু করিয়া অর্থ সম্মান শিক্ষাদীক্ষা চালচলনের পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহানুভূতির একটা যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে, এই মাত্র। স্যার কে এল এর জীবনে কোনো অঘটন ঘটার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি?

হঠাৎ রাজকুমারের মনে হয়, যা ঘটিয়াছে সেটা স্যার কে এল-এর ব্যক্তিগত কিছু নয়, তার কেন্দ্র নিশ্চয় রিণি। নিজের জীবনে স্যার কে এল-এর এমন কিছু ঘটিতে পারে না তাকে যা না বলিলে তার চলে না এবং বলিতে গিয়া এমন নার্ভাস হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু রিণি? কি হইয়াছে রিণির?

রিণি কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয়নি রিণির সঙ্গে?

রিণিও তাই বলছিল। তুমি আর যাও না।

রাজকুমার একটু অস্বস্তির সঙ্গে স্যার কে এল-এর মুখের দিকে তাকায়। রিণির কথা তোলা মাত্র তার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে, অতি ধীরে ধীরে তিনি কাগজ কাটা ছুরির ডগা দিয়া রেখা আঁকিয়া চলিয়াছেন ব্লটিং প্যাডের এক প্রান্ত হইতে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। তার কথা, ভঙ্গি ও মুখের ভাবের কোনো মানেই রাজকুমার বুঝিতে পারে না। রিণি কি স্যার কে এল-এর কাছে তার সেই অভদ্র অনুরোধের কথা বলিয়া দিয়াছে? স্যার কে এল কি সেই জন্য তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? কিন্তু সে যখন আর রিণিকে বিরক্ত করিতে যায় না, গায়ে পড়িয়া তাকে আপিসে ডাকিয়া পাঠাইয়া সে কথা তুলিবার তো কোনো অর্থ হয় না।

পরশু রিণি আমাকে সব বলেছে রাজু।

রাজকুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রিণি সব বলিয়াছে। ভালো কথা। স্যার কে

এল তাকে কী বলিবেন? উপদেশ দিবেন? গালাগালি? লজ্জা, ভয়, আপশোশ কিছুই রাজকুমার বোধ করে না, রিণির উপর রাগও হয় না। রিণির মন তার অজানা নয়। সে মনে কত খেয়াল, কত ঝোঁক, কত জিদ, আর কত আত্মপীড়নের পিপাসা আছে সে তার পরিচয় রাখে। এ রকম মন যাদের হয়, জীবনকে জটিল করাই তাদের ধর্ম। কোনোদিন যদি অসাধারণ কিছু ঘটে জীবনে, সেই ঘটনার জের টানিয়া চলিতে চায় সারা জীবন, প্রেমে অথবা বিদ্বেষে সমাপ্তিকে অস্বীকার করিতে চায়, আগেই অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ফেলায় শেষ হইতে দিলেই এখন তাদের লোকসান।

বন্ধু একদিন তার অনাবৃত দেহ দেখিতে চাহিয়াছিল, একি রিণি ভুলিতে পারে অথবা বন্ধুর সঙ্গে শুধু সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াই এমন একটা ব্যাপারকে শেষ হইতে দিতে পারে। স্যার কে এল রাজকুমারকে পছন্দ করেন? রাজকুমার যে কী ভয়ানক মানুষ তার প্রমাণ দিয়া বাপের ধারণার নাটকীয় পরিবর্তন না ঘটাইয়া রিণি থাকিতে পারিবে কেন! রাজকুমারের প্রতি স্যার কে এল-এর ক্রোধ ও বিদ্বেষ জাগিবে, অতীতে বিলীন হইয়া যাওয়ার বদলে জের টানা চলিতে থাকিবে রাজকুমারের অসভ্যতার, রিণির হৃদয় মনে নূতন করিয়া ছোঁয়াচ লাগিবে উত্তেজনার, আগে হয়তো রাজকুমারের জ্বালা বোধ হইত, গিরির হাত টানার ব্যাপারে যেমন হইয়াছিল। এখন সে রিণির জন্য মমতাই বোধ করে। নিজের জন্য অকারণে যন্ত্রণা সৃষ্টি করার এই নেশা চিরদিন মেয়েটার জীবনের অভিশাপ হইয়া থাকিবে।

তোমার সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা ছিল, রাজু। আমার একটা অহংকার আছে, আমি মানুষ চিনতে পারি। এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলাম, তুমি এতবড়ো রাসকেল। সোজাসুজি কয়েকটা কথা আলোচনা করার জন্য তোমাকে তাই ডেকে পাঠিয়েছি।

আলোচনা করে লাভ কী হবে?

রিণি আমার মেয়ে রাজু। আমার আর ছেলে-মেয়ে নেই।

এ কথাটা কেন বললেন বুঝতে পারছি না।

স্যার কে এল পাইপটা মুখে তুলিয়া কামড়াইয়া ধরিলেন, তারপর আবার নামাইয়া রাখিলেন।

তুমি সব অস্বীকার করতে চাও?

না, অস্বীকার করতে চাই না। রিণির সঙ্গে অভদ্রতা করেছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। আমার কী উদ্দেশ্য ছিল বলে লাভ নেই। আপনি বুঝতেও পারবেন না, বিশ্বাসও করবেন না।

অভদ্রতা। কি বলছ তুমি?

রাজকুমার কিছুই বলিল না। রিণির সঙ্গে তার ব্যবহারের সংজ্ঞা লইয়া কি স্যার কে এল তর্ক করিতে চান? বলিতে চান ওটা অভদ্রতার চেয়ে আরও খারাপ কিছু?

ফাঁসির ভয় না থাকলে তোমায় আমি খুন করতাম রাজু। তুমি রিণির যা ক্ষতি করেছ সে জন্য নয়, তোমার এই মনোভাবের জন্য। রিণির কাছে সব শুনেও তোমায় আমি একা দোষী করিনি। রিণি ছেলেমানুষ নয়, তারও উচিত ছিল নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। দুদিন ধরে আমি ক্রমাগত নিজেকে কি বুঝিয়েছি জানো? কেবল তুমি আর রিণি নও, আরও অনেক ছেলেমেয়ে এ রকম ভুল করেছে, রিণি আমার মেয়ে বলেই আমার মাথা খারাপ করলে চলবে না, ভুল করলে চলবে না। রিণিকে তুমি বিয়ে করবে কি না, না করলে কেন করবে না, খোলাখুলিভাবে এই কথাগুলি জিজ্ঞেস করব বলে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এক বছর একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করা যখন তোমার কাছে শুধু অভদ্রতা, তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। তোমাকে বলা বৃথা, তবু বলছি, যদি পার স্যুইসাইড কোরো। তোমার মতো মন নিয়ে কারও বেঁচে থাকা উচিত নয়। আচ্ছা, এবার তুমি যাও রাজু।

কথা বলিতে রাজকুমারের সাহস হইতেছিল না। রিণি সব বলিয়াছে যা ঘটে নাই, যা ঘটিতে পারিত না। কিছুই বলিতে বাকি রাখে নাই। কেন বলিয়াছে? কী চায় রিণি? তার উদ্দেশ্য কী? যতই বিকার থাক মনে, রিণি তো পাগল নয়। তাকে জড়াইয়া বাপের কাছে এই অদ্ভুত অকথ্য কাহিনি সে বলিতে গেল কেন? তাকে সে পাইতে চায়, বিবাহের মধ্যে, চিরদিনের জন্য? কিন্তু তাকে পাওয়ার জন্য এই উদ্ভট উপায় সে অবলম্বন করিবে কেন? রিণি তো কোনোদিন জানিতেও দেয় নাই, তাকে তার চাই।

যদি ধরা যায় তখন রিণিও নিজেকে জানিত না, সেদিনকার রাগারাগির পর এতদিনের অদর্শনে তার খেয়াল হইয়াছে, নিজেই তাকে ক্ষমা করিয়া তাকে তো সে কাছে ডাকিতে পারিত, চেষ্টা করিতে পারিত তাকে জয় করার। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তাকে পাওয়ার আর কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইলে রিণি যদি এই পাগলামি করিত, তার একটা মানে বুঝা যাইত।

তোমায় যেতে বলেছি রাজু।

কাল আমি একবার রিণির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্যার কে এল সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, কেন?

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল।—আপনার সঙ্গে কথা বলার আগে রিণির সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। এমন তো হতে পারে, আপনি সব কথা জানেন না, রিণি আপনাকে সব বলতে পারে নি? আপনি ধরে নিন, রিণি আর আমার মধ্যে কয়েকটা ভুলবোঝা আছে, ধরে নিয়ে কাল তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিন।

ব্লটিং প্যাডের দিকে চাহিয়া স্যার কে এল চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া রাজকুমারও নীরবে বাহির হইয়া গেল।

পথে নামিতে মালতীর কাছে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া যাওয়ার জন্য রাজকুমার ট্যাক্সি ডাকিল না, ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিতে লাগিল। দেহে মনে সুন্দর সরসীকে আশ্রয় করিয়া

সে যে আনন্দের জগতে উঠিয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে আবার মাটিতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। চলিতে চলিতে রাজকুমারের মনে হয় সে কি সত্যই কিছু পাইয়াছিল, আনন্দ অথবা শান্তি? এখন তো তার মনে হইতেছে,কয়েকটা দিন সে শুধু অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

চলিতে চলিতে মালতীর কথা ভাবিয়া রাজকুমার শ্রান্তি বোধ করে। কী মধুর ছিল মালতী-সম্পর্কে তার গুরুতর কর্তব্যের কল্পনা কয়েক মুহূর্ত আগে। মালতীকে ভালোভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে মালতী কী চায়। জীবনের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে চলিতে একটি বিচ্ছিন্ন ফুল অস্থায়ী বাধায় আটকাইয়া গিয়াছে, ভাবিতেছে এইখানে বুঝি তার ভাসিয়া চলার শেষ, আবার তাকে ভাসিয়া যাওয়ার সুযোগ দিতে হইবে তার নিজস্ব পরিণতি, স্থায়ী সার্থকতার দিকে। এই কাজটুকু করিবে ভাবিয়াই নিজেকে রাজকুমারের দেবতা মনে হইতেছিল। ভীরু দুর্বল মানুষের মতো এখন তার মনে হইতে থাকে, মালতীর মুখোমুখি হওয়া একটা বিপদ, মালতীকে কিছু বুঝানোর চেষ্টা বিপজ্জনক সম্ভাবনায় ভরা।

অবিশ্বাস্য, তবু সত্য। মালতী যে ঘরে তার প্রতীক্ষা করিতেছিল তার রুদ্ধ দরজায় টোকা দেওয়ার সময় রাজকুমার পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিল যে, দরজার ওপাশে মালতীর স্পর্শ ছাড়া আর সমস্তই অর্থহীন। কথা অবশ্য সে বলিতে পারে যত খুশি, কিন্তু কথার কোনো মানে থাকিবে না। স্যার কে এল-এর শ্যাম্পেনের বোতল খোলার আওয়াজের মতো কথা হইবে শুধু তৃষ্ণার সংকেত, পানীয়ের আহ্বান।

আজ হঠাৎ নয়, চিরদিন এমনি ছিল, মনের অনেক দরজার ওপাশে অনেক মালতীর স্পর্শ। এইমাত্র শুধু সেটা জানা গেল। আকাশের মেঘে সে বাসা বাঁধিয়াছিল, সেখান হইতে নামাইয়া আনিয়া রিণি তাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাই জানা গেল। সন্দেহ করার ভরসাও তার নাই। অভিজ্ঞতার মতো এ ভাবে যা জানা যায় তাতে কী আর ভুলের সুযোগ থাকে? একটি রহস্য শুধু এখন বিস্ময়ের মতো জাগিয়া আছে যে, মালতী কেন? যার জন্য নিজের স্নেহকে একদিন ভালোবাসা মনে হইয়াছিল, সে কেন? রিণি আর সরসী থাকিতে মালতী কেন এ অভাবনীয় রূপকে পরিণত হইয়া গেল?

চুলোয় যাক। মালতীকে দুয়ার খুলিবার সংকেত জানাইবার পর মালতী দুয়ার খুলিয়া দেওয়া পর্যন্ত কয়েক মুহূর্ত রাজকুমার ভাবিয়াছিল—চুলোয় যাক। কী আসে যায় মালতী যদি শ্যামলকে ভালোবাসে আর সেই ভালোবাসাই তাকে ঠেলিয়া দেয় তার পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজকুমারের দিকে, রাজকুমারকে সে শুধু ভালোবাসিতে চায় বলিয়া, রাজকুমারকেই তার ভালোবাসা উচিত এই ধারণা পোষণ করে বলিয়া? এ তো সর্বদাই ঘটিতেছে। ভালোবাসিবার দুরন্ত ইচ্ছা যে ভালোবাসা নয় এ জ্ঞান অনেকের যেভাবে আসিয়াছে মালতীরও সেভাবে আসুক—আজ রাত্রি শেষে, অথবা আগামী কাল। সে নিজে

অবশ্য সব জানে। কিন্তু জানা কথা না জানার ভান করা নিজের কাছে এমন কী কঠিন? তার ফরমুলা তো বাঁধাই আছে—আজিকার রাত্রি স্মরণীয় হোক, কাল চুলোয় যাক।

ঘরের ভিতরে গিয়া এ ভাবটা অবশ্য তার কাটিয়া গেল। কিন্তু জড়ের গতিবেগের মতোই আবেগের গতি, বেগ থামিবার পরেও গতি হঠাৎ থামে না। আপনা হইতেই খানিকটা আগাইয়া চলে।

খাটে বসিয়া রাজকুমার বলে, দেরি হয়ে গেছে, না?

মালতী অস্ফুট স্বরে বলে, হ্যাঁ।

একলা কষ্ট হচ্ছিল?

আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার এতক্ষণে মালতীর দিকে তাকায়। দেয়ালে নিচু ব্র্যাকেটে আলো জ্বলিতেছে, মেঝে আর ওপাশের দেয়ালে মালতীর ছায়া পড়িয়াছে, ছায়ায় তার শাড়ির বিন্যাস ও অবিন্যাস স্পষ্টতর। পিছনের দেয়ালের পটভূমিকায় মালতীকে দেখাইতেছে মনের ক্যামেরায় তোলা পুরানো ফটোর মতো অস্পষ্টতার রহস্যে রহস্যময়ী—আধ-ভোলা স্মৃতি যেন ঘিরিয়া আছে তাকে। তাড়াতাড়ি কয়েকবার চোখের পলক ফেলিয়া রাজকুমার নিজের চোখের জলীয় ভ্রান্তিকেই যেন মুছিয়া দিতে চায়, তারপর হারানো গোধূলির নিষ্প্রভ দিগন্তে সোনার থালার মতো নতুন চাঁদকে উঠিতে দেখিয়া শিশু যেভাবে চাহিয়া থাকে তেমনি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতে থাকে মালতীকে। সরসীকে তার মনে পড়িতেছে, হৃদয়-সাগর-মন্থনে উত্থিতা উর্বশী সরসীকে। সে যেন কতদিনের কথা, রাজকুমার যেন ভুলিয়া গিয়াছিল। তেমনি অনবদ্য নগ্নতার প্রতিমূর্তির মতো মালতীকে ওইখানে, যেখানে সে দাঁড়াইয়া আছে কৃত্রিম আলোয় সাজানো পুতুলের মতো, দাঁড় করাইয়া দুচোখ ভরিয়া তাকে দেখিবার জন্য রাজকুমারের হৃদয় উতলা হইয়া উঠে। দেহে মনে আবার সে যেন সেদিনের মতো নবজীবনের, মহৎ আনন্দের সঞ্চার অনুভব করে। তার আশা হয়, সরসীর মতো মালতীও আজ তাকে সমস্ত শ্রান্তি ও ক্ষোভ ভুলাইয়া দিতে পারিবে, আবার নিরুদ্‌বেগ মুক্তি জুটিবে তার, আবার সে উঠিতে পারিবে তার আকাশের আবাসে, যে কুলায় ছাড়িয়া নিজের ইচ্ছায় সে নামিয়া আসে নাই।

নিজের অজ্ঞাতসারে রাজকুমার উচ্চারণ করিতে থাকে, মালতী! মালতী! পথহারা শ্রান্ত মুমূর্ষু শিশু যেভাবে তার মাকে ডাকিয়া কাতরায়।

কিন্তু মালতী শুধু মাথা নাড়ে। রাজকুমার বুঝিতে পারে না, আবার আবেদন জানায়। মালতী মাথা নাড়ে আর আঁচলের প্রান্ত দিয়া নিজেকে আরেকটু ঢাকিতে চেষ্টা করে। কথা যখন সে বলে তার কণ্ঠস্বর শোনায় কর্কশ।

মালতী বলে, শোনো। আমার কেমন যেন লাগছে।

কেমন লাগছে মালতী?

গা গুলিয়ে বমি আসছে।

ক্রোধ, বিরক্তি আর বিষাদে রাজকুমারের অনুভূতির আধারে ফেনিল আবর্তের সৃষ্টি হয়। তীব্র সংকীর্ণ বেদনার পুনরাবৃত্তিময় সংক্ষিপ্ত আবেদন ক্ষণিকের নির্বিকার শান্তিতে লয় পায় আর আর্তনাদ করিয়া ওঠে। সে অনুভব করে, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে অনুভব করে, ভয় ও শ্রদ্ধার বশ্যতা, কাব্য ও স্বপ্নের মোহ, আবেগ ও উত্তেজনার তাগিদ, কিছুই মালতীকে ভুল করিতে দিবে না। তার দিকে মালতির গতি বন্ধ করিয়া কোনদিকে তাকে চলিতে হইবে দেখাইয়া দিবার কথা সে যা ভাবিয়াছিল, তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মালতী আর আগাইবে না। সে ডাকিলেও নয়, হাত ধরিয়া টানিলেও নয়। শুধু আজ নয়, চিরদিন এই পর্যন্তই ছিল মালতীর ভুলের সীমা। ভুল কি ভুল নয় তাও হয়তো মালতী জানে না, এখনও হয়তো সে ধরিয়া রাখিয়াছে আজ রাত্রিই তার প্রিয়মিলনের রাত্রি, কিন্তু রাজকুমার দু বাহু বাড়াইয়া দিলে সে আসিয়া ধরা দিবে না।

মালতীর সম্বন্ধে এ যে তার কল্পনা নয় সে বিষয়ে রাজকুমারের এতটুকু সন্দেহ থাকে না, অশোকতরুমূলে ক্লেশপাণ্ডুবর্ণা অধোমুখী সীতার দিকে চাহিয়া দেবতা ব্রহ্মা আর রাক্ষসী নিকষার পুত্র রাবণ যে যন্ত্রণায় অমরত্বের প্রতিকার চাহিত, রাজকুমারও তেমনি যন্ত্রণা ভোগ করে। রাবণের তবু মন্দোদরী ছিল, জীবনে রাবণ তবু ভালোবাসিয়াছিল সেই একটিমাত্র নারীকে, একটু ভালোবাসিবে রাজকুমার এমন তার কেউ নাই। তাছাড়া, তার সীতাকে সে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রায় গায়ের জোরের মতোই ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে ছলবলকৌশল করিয়া রাখিয়া এতদিন সে মালতীকে হরণ করিয়া রাখিয়াছিল, আজ ভাবিয়াছিল, তার মনটি পর্যন্ত মুক্ত করিয়া শ্যামলকে ফিরাইয়া দিবে। এই উদারতার কল্পনাটুকু পর্যন্ত তার মিথ্যা, অকারণ অহংকার বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল।

নিছক অহংকার, অতি সস্তা আত্ম-তৃপ্তি, নিজেকে কেন্দ্র করিয়া শিশুর মতো রূপকথা রচনা করা। মালতী কবে তার বশে ছিল যে আজ তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা সে ভাবিতেছিল? কোনো কিছু দাবি করে নাই বলিয়াই তার সম্বন্ধে মালতীর মোহ এতদিন টিকিয়া ছিল, দাবি জানানো মাত্র মালতী ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া যাইত, হয়তো ঘৃণা পর্যন্ত করিতে আরম্ভ করিত তাকে।

বাড়ি যাবে মালতী?

একটু শুয়ে থাকি। বড়ো অস্থির অস্থির করছে।

রাজকুমার বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মালতী গিয়া শুইয়া পড়িল।

দরজা বন্ধ করে এতক্ষণ ঘরে বসে ছিলাম বলে বোধ হয়।

তা হবে।

মিছিমিছি রুমটা নেওয়া হল।

তাতে কী।

সাতটা টাকা নষ্ট। কী চার্জ। একরাত্রির জন্য একটা রুম। তার ভাড়া সাত টাকা।

কে জানত হঠাৎ বিশ্রী লাগবে শরীরটা?

ও রকম হয় মালতী।

এক হিসাবে ভালোই হয়েছে। তুমি বেঁচে গেলে।

মালতীর ঠোঁটে এলোমেলো নড়াচড়া চলে, চোখের পাতা ঘনঘন ওঠে নামে। চুলগুলি বিশৃঙ্খল হইয়া আছে। তার শোয়ার ভঙ্গিতেই গভীর অবসন্নতা। মহাকাব্যের শৃঙ্গারশ্রান্তা রমণীর বর্ণনা রাজকুমারের মনে পড়িয়া যায়।

রাজুদা—একটা কথা বলি শোনো। তুমি কী ভাববে জানি না। আমি একটা বিশ্রী উদ্দেশ্য নিয়ে আজ এসেছিলাম। মানে, আমার উদ্দেশ্য ভারী খারাপ ছিল।

বল কী, ভারী আশ্চর্য কথা তো।

মালতীর বিবর্ণ মুখে রঙের প্লাবন আসিয়া আটকাইয়া রহিয়া গেল।

তা নয়। ঠিক তা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে তা হলে তুমি বাধ্য হয়ে বিয়ে করবে।

কেন? নাও তো করতে পারতাম।

তামাশা করছ? এই কি তোমার তামাশার সময় হল? আমার এদিকে মাথা ঘুরছে, কী ভাবছি কী বলছি বুঝতে পারছিলে না—রাগ করেছ নাকি? তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ। তাই এমনিভাবে ছাড়া ছাড়া কথা বলছ—রাগ হয়েছে তোমার।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তার রাগের চিহ্ন খুঁজিতে খুঁজিতে মালতী একেবারে উঠিয়া বসে।

রাগ করেছ কেন? তুমি তো জানো তুমি যা চাইবে তাই হবে, আমি কথাটি বলব না। সত্যি বলছি, বিয়ের কথা আর মনেও আনব না। এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম একলাটি ঘরে বসে। তুমি যখন ওসব অনুষ্ঠান পছন্দ করো না, আমার কাজ নেই বাবা বিয়ে ফিয়েতে। কিন্তু মালতীর গলায় করুণ মিনতির সুর ফুটিয়া উঠিল, আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। বলো রাখবে?

কী কথা মালতী?

একরাত্রির জন্য রুম নিয়ে নয়, চলো আমরা কোথাও চলে যাই দুজনে, মাস তিনেকের জন্যে। অন্তত দুমাস। কিছুদিন এক সঙ্গে এক বাড়িতে যদি না রইলাম—

আজ রাত্রিকে বাতিল করার সমর্থনে এই জোরালো যুক্তি মালতী আবিষ্কার করিয়াছে। আরম্ভ হওয়ার আগেই কাব্য প্রেম স্বপ্ন আর কল্পনা শুধু মনের উদ্‌বেগ আর দেহের অস্থিরতায় যে পরিণত হইয়া গেল তার তো একটা কারণ থাকা চাই? সে কারণটি এই। একটি বিচ্ছিন্ন রাত্রির অসম্পূর্ণ ভাঙা প্রেম তার ভালো লাগিবে না। কাল সকালে ছেদ পড়িবে ভাবিয়া মিলনকে সে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, শুধু এই কারণে দেহমন তার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারকে সে ভালোবাসে বইকী?

রাজকুমার নীরবে একটু হাসিল। ভাবিল, মালতী তার অর্থহীন হাসির যা খুশি

মানে করুক, কিছু আসিয়া যায় না। মালতীর সঙ্গে বুঝাপড়ারও কোনো প্রয়োজন নাই। মালতী একদিন নিজেই বুঝিতে পারিবে। মালতীর পক্ষে সে ভাবে সব বুঝিতে পারাই ভালো।

পরদিন ছুটি ছিল, সকালে কয়েকটি বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিল। রাজকুমার বেকার, তার ছুটিও নাই। একটু সে ঈর্ষা বোধ করিল বন্ধুদের জীবনে কাজের দিনগুলির মধ্যে ছুটির দিন সত্যসত্যই অনেকখানি পৃথক হইয়া আসে বলিয়া। অনেক বেলায় সরসীও আসিয়া হাজির। যত বড়ো বড়ো ঘটনাই ঘটুক সরসীর জীবনে, কোনোদিন তার মনে কিছু ঘটে না, কোনোদিন সে বদলায় না, চিরদিন সে একরকম থাকিয়া গেল। আজও তার প্রকাণ্ড একটা মিটিং আছে। রাজকুমার যেন নিশ্চয় যায়। একটু প্রস্তুত হইয়াই যেন যায়, কিছু বলিতে হইবে।

সেদিনের মতো কেলেঙ্কারি কোরো না।

কেলেঙ্কারি করেছিলাম নাকি সেদিন?

প্রায়। শেষটা সামলে গেলে তাই রক্ষা। ঘরোয়া মিটিং ছিল বলে সামলে নেবার সুযোগ পেলে, পাবলিক মিটিং হলে আগেই লোকে হাসতে আরম্ভ করত।

তা হইবে। সেদিন মস্ত একটা বাহাদুরি করিয়াছে এ ধারণাটা এতদিন বজায় রাখিতে না দিয়া আগে সরসী এ খবরটা দিলে ভালো হইত।

রিণির কি হয়েছে জানো সরসী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল।

কী হয়েছে?

আমি তো তাই জিজ্ঞাসা করছি। বাড়ি থেকে নাকি বার হয় না, কারোর সঙ্গে দেখা করে না। পরশু গিয়েছিলাম, দরজা বন্ধ করে কী যেন করছিল, দরজা খুলল না, ভেতর থেকেই আমায় বসতে বলল। বসে আছি তো বসেই আছি, দরজা খোলে না। দুবার ডাকলাম, সাড়াও দিলে না। শেষে আমি যখন ডেকে বললাম, আমার কাজ আছে আমি চললাম, একটা যাচ্ছেতাই জবাব দিলে।

কী বললে?

সে আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

আমার সম্বন্ধে কোনো কথা?

না। তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলবে? একটা বিশ্রী ফাজলামি করলে, একেবারে ইতরামি যাকে বলে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, কালীর সঙ্গে একটু ভাব জমানোর চেষ্টা করিয়া সরসী চলিয়া গেল। সরসীকে কালী পছন্দ করে না, রাজকুমারের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে দেখিলেই তার মুখ কালো হইয়া যায়। এক মিনিটের বেশি কাছে থাকিতে পারে না কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার কাছে আসে। সরসী আর রাজকুমারের মুখের দিকে তাকায়, ঠোঁট

কামড়ায়, হঠাৎ একটা খাপছাড়া কথা বলে, দুপদাপ পা ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সেদিন মনোরমার তিরস্কারের পর কালী কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। মনোরমা যতটুকু সাজাইয়া দেয় তার উপর সে নিজে নিজে অরেকটু বেশি করিয়া সাজ করে। গায়ে একটু বেশি সাবান ঘষে, মুখে একটু বেশি ক্রিম মাখে, একটু বেশি দামের কাপড় পরে।

সরসী চলিয়া যাওয়ামাত্র সে বলিল, এই মেয়েটা এলে আপনি পৃথিবী ভুলে যান।

এই মেয়েটা আমার কে কালী?

যার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলেন—আপনার সরসী?

ওকে তুমি সরসীদি বলবে।

আমার বয়ে গেছে ওকে দিদি বলতে।

মুখ উঁচু করিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া সিধা হইয়া কালী মূর্তিমতী বিদ্রোহের মতো দাঁড়াইয়া থাকে, তার চোখ দুটি কেবল জলে বোঝাই হইয়া যায়। রাজকুমার অন্যমনে রিণির কথা ভাবিতেছিল, অবাক হইয়া সে কালীর দিকে চাহিয়া থাকে। এতটুকু মেয়ের মধ্যে ভাবাবেগের এই তীব্রতা সে হঠাৎ ঠিকমতো ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না।

কী উদ্দেশ্যে এবং কেন কিছু না ভাবিয়াই, সম্ভবত আহত সকাতর শিশুকে আদর করার স্বাভাবিক প্রেরণার বশে, কালীর দিকে সে হাত বাড়াইয়া দেয়। কালীর নাগাল কিন্তু পায় না, দুহাতে তাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া কালী ছুটিয়া পালাইয়া যায়।

সমস্ত দুপুর রাজকুমার বিষন্ন হইয়া থাকে। বাহিরে কড়া রোদ, ঘরে উজ্জ্বল আলো, রাজকুমারের মনে যেন সন্ধ্যার ছায়া, অমাবস্যা রাত্রির ছদ্মবেশী আগামী অন্ধকার। একটা কষ্টবোধও যেন সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রাত্রি জাগরণের পর যেমন হয়। রাত্রে সে তো কাল ঘুমাইয়াছিল, সমস্ত রাত ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছে?

বিকালে রাজকুমার রিণিদের বাড়ি গেল।

দারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল স্যার কে এল বাড়িতেই আছেন, সারাদিন একবারও তিনি বাহিরে যান নাই। রিণির অসুখ, দুবার ডাক্তার আসিয়াছিল।

অসুখ? নীচের হলে গিয়া দাঁড়াইতে রিণির ভাঙা ভাঙা গানের সুর রাজকুমারের কানে ভাসিয়া আসে। তারপর হঠাৎ এত জোরে সে বাড়ির দাসীকে ডাক দেয় যে তার সেই শেষ পর্দায় তোলা তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর যেন ঘরের দেয়ালে, ঘরের বাতাসে, রাজকুমারের গায়ে আঁচড় কাটিয়া যায়, ডাক্তারকে দুবার আসিতে হইয়াছিল রিণির এমন অসুখ। আগাগোড়া সবটাই কি রিণির তামাশা? কেবল তার সঙ্গে নয়, বাড়ির লোকের সঙ্গেও সে কী খেলা করিতেছে—তার বিকারগ্রস্ত মনের কোনো এক আকস্মিক ও দুর্বোধ্য প্রেরণার বশে?

ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া রিণিকে দেখিবামাত্র এ সন্দেহ তার মিটিয়া গেল। রিণির সত্যিই অসুখ করিয়াছে। তার চুল এলোমোলো, আঁচল লুটাইতেছে মেঝেতে, মুখে ও চোখে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের লক্ষণ। অথচ শুইয়া থাকার বদলে সে অস্থির ভাবে এদিক

ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে। এক পাশে চেয়ারে মড়ার মতো হেলান দিয়া বসিয়া স্যার কে এল হতাশভাবে তার দিকে চাহিয়া আছেন।

রাজকুমারকে দেখিয়াও রিণি যেন দেখিতে পাইল না। কেবল স্যার কে এল হঠাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া রাজকুমারের সামনে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াইলেন, রাজকুমারকে কিছু যেন বলিবেন। তারপর একটি কথাও না বলিয়া নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলেন।

ছোটো বুকশেল্‌ফটির কাছে গিয়া একটি একটি করিয়া বই বাছিয়া মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে রিণি গুনগুনানো সুর ভাঁজিতে লাগিল।

রিণি।

কে? অ! রিণি একটু হাসিল, বোসো না? বইগুলো একটু বেছে রাখছি—যত বাজে বই গাদা হয়েছে।

তোমার কী হয়েছে? জ্বর?

কিছু হয়নি তো।

রাজকুমার বসিল। বই থাক রিণি। এখানে বোসো।

রিণি চোখের পলকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।—দ্যাখো, হুকুম কোরো না বলছি। একশোবার বলিনি তোমায়, আমার সঙ্গে নরম সুরে কথা কইবে? তোমরা সব্বাই আমায় নিয়ে মজা করো জানি, তা করো গিয়ে যা খুশি, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ভদ্রভাবে করবে—রেসপেক্টফুলি।—উঁ? তাই বটে, ভুলে গিয়েছিলাম। কী যেন বললে তুমি?

রাজকুমার অত্যন্ত নরম সুরে বলিল, বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

রিণি আসিয়া পাশে বসিবার পরেও রাজকুমার তার দিকে চাহিয়া থাকে, কোন অনুভূতি হৃদয়ে আলোড়ন তুলিয়াছে বুঝিতে পারে না। কাছে আসিবার পর এখন রিণির চোখ দেখিয়া সে যেন বুঝিতে পারে তার কী হইয়াছে। রিণির চাহনি স্পষ্টভাবেই তার কাছে সব ঘোষণা করিয়া দেয়, কিন্তু মনে মনে রাজকুমার প্রাণপণে সে সংবাদকে অস্বীকার করে। তার মনে হয়, রিণির সম্বন্ধে এই ভয়ংকর সত্যকে স্বীকার করিলে তার নিজের মাথাও যেন খারাপ হইয়া যাইবে।

রিণি ব্লাউজের বোতাম লাগায় নাই, লুটানো কাপড় তুলিয়া রাজকুমার তার গায়ে জড়াইয়া দিল। রিণির সঙ্গে এখন কথা বলা না বলা সমান, কোনো বিষয়েই তার সঙ্গে আলোচনা করার আর অর্থ হয় না। তবু তাকে বলিতে হইবে। রিণি সুস্থ আর স্বাভাবিক অবস্থাতে আছে ধরিয়া লইয়াই তার সঙ্গে তাকে আলাপ করিতে হইবে। নতুবা নিজে সে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

তোমার বাবাকে ও সব বলতে গেলে কেন রিণি?

রিণির মুখের বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।—বাবাকে? কী বলেছি বাবাকে?

আমার সম্বন্ধে?

তোমার সম্বন্ধে? কই না, কিছুই তো বলিনি বাবাকে তোমার সম্বন্ধে? বাবার সঙ্গে আমি কথাই বলি না যে।

পলকহীন দৃষ্টিতে রিণি রাজকুমারের চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকে, তার মুখের ভাবের সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটে না। তারপর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠে ক্রোধের অভিব্যক্তি।

দাঁড়াও, ডাকছি বাবাকে।

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া বলে, থাক, রিণি থাক। বারণ কানে না তুলিয়া সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত আগাইয়া গিয়া তীক্ষ্মকণ্ঠে চিৎকার করিয়া রিণি স্যার কে এলকে ডাকিতে থাকে, বাবা? বাবা? ড্যাডি? ড্যাডি?

স্যার কে এল উপরে আসিতেই হাত ধরিয়া তাকে সে টানিয়া আনে রাজকুমারের সামনে, কাঁদোকাঁদো হইয়া বলে, রাজুদার নামে তোমায় আমি কী বলেছি বাবা?

স্যার কে এল শান্তকণ্ঠে বলেন, কই না, কিছুই তো বলোনি তুমি?

বলেছি। রাজুদা আমার বেষ্ট ফ্রেন্ড, তাই বলেছি। নিন্দে করে কিছু বলিনি। বলেছি বাবা?

না। বলোনি।

নিশ্চিত হইয়া রাজকুমারের পাশে বসিয়া রিণি গভীর নিশ্বাস ফেলিল। বিড়বিড় করিয়া আরও কত কী সে বলিতে লাগিল বুঝা গেল না। একটু অপেক্ষা করিয়া স্যার কে এল চলিয়া গেলেন।

রাজকুমার বলিল, একটু শুয়ে থাকবে রিণি?

রিণি উদাস ভাবে বলিল, তুমি বললে শুতে পারি।

তোমার শরীর ভালো নেই, শুয়েই থাক। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

তুমি আর আসবে না।

আসব, নিশ্চয় আসব।

বিনা দ্বিধায় রাজকুমার তাকে শিশুর মতো দুহাতে বুকে তুলিয়া বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল। তার অনেক দিনের লিপস্টিক ঘষা ঠোঁটে আজ শুকনো রক্ত মাখা হইয়া আছে। সন্তর্পণে সেখানে চুম্বন করিয়া সে নীরবে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে স্যার কে এল টেবিলে মাথা রাখিয়া বসিয়া ছিলেন, টেবিলে তার মাথার একদিকে একটি আধ খালি মদের বোতল অন্যদিকে শূন্য একটি গেলাস। রাজকুমারের সাড়া পাইয়া মুখ তুলিলেন।

নার্ভাস ব্রেক ডাউন? রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল।

স্যার কে এল মাথা নাড়িলেন।—ইনস্যানিটি।

ডাক্তার কী বললেন?

এখন আর ওর বেশি কী বলবেন? সারতেও পারে, নাও সারতে পারে। ভালো

রকম এগজামিনের পরে হয়তো জানা যাবে।

পরস্পরের মাথার পাশ দিয়া পিছনের দেয়ালে চোখ পাতিয়া দুজন অনেকক্ষণ নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

তারপর স্যার কে এল ধীরে ধীরে বলিলেন, আমার আলমারি খুলে বোতল নিয়ে কদিন নাকি খুব ড্রিঙ্ক করছিল। কিছু টের পাইনি। ডাক্তার সন্দেহ করছেন খুব ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল, অতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করার ফলে দুচার দিনের মধ্যে এটা হয়েছে। রিণি ড্রিঙ্ক করত নাকি জানো?

কদাচিৎ কখনও একটু চুমুক দিয়ে থাকতে পারে, সে কিছু নয়।

স্যার কে এল-এর মাথা নীচে নামিতে নামিতে প্রায় গেলাসে ঠেকিয়া গিয়াছিল তেমনি ভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামে রিণি যা বলেছিল রাজু?

সব কল্পনা।

তোমায় নিয়ে কেন?

তা জানি না।

আবার দুজনে নীরবে মুখোমুখি বসিয়া রহিল।

রিণির জন্য সকলের গভীর সহানুভূতি জাগিয়াছে। খবর শুনিয়া মালতী তো একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। রিণিকে কে পছন্দ করিত কে পছন্দ করিত না এখন আর জানিবার উপায় নেই। একেবারে পাগল হইয়া রিণি শত্রুমিত্র সকলের জীবনে বিষাদের ছায়াপাত করিয়া ছাড়িয়াছে। দুঃখবোধ অনেকের আরও আন্তরিক হইয়াছে এই জন্য যে তাদের কেবলই মনে হইয়াছে, সকলের মন টানিবার জন্য রিণি যেন ইচ্ছা করিয়া নিজেকে পাগল করিয়াছে। অহংকারী আত্ম-সচেতন রিণিকে আর কেউ মনে রাখে না, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন শুধু মনে পড়ে কী তীব্র অভিমান ছিল মেয়েটার, আঘাত গ্রহণের অনুভূতি তার চড়া সুরে বাঁধা সরু তারের মতো মৃদু একটু ছোঁয়াচেও কী ভাবে সাড়া দিত।

সরসী অত্যন্ত বিচলিতভাবে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করে, ও কেন পাগল হয়ে গেল রাজু?

রাজকুমার নির্বোধের মতো পুনরাবৃত্তি করে, কেন পাগল হয়ে গেল?

সরসী তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, না, তুমিই বা জানবে কী করে?

রাজকুমার নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসে।

—কিছুদিন আগে হলে তোমার প্রশ্নের জবাবে কী বলতাম জানো সরসী? বলতাম, রিণি কেন পাগল হয়েচে জানি, আমার জন্য।

তোমার জন্য?

আগে হলে তাই ভাবতাম। ও রকম ভাবার যুক্তি কি কম আছে আমার। তুমি সব জানো না, জানলে তোমারও তাই বিশ্বাস হত।

সরসী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাজকুমার অপেক্ষা করে, অনেকক্ষণ। সরসী কিন্তু মুখ খোলে না।

কী সব জান না, জানতে চাইলে না সরসী?

না।

বললে শুনবে না?

শুনব।

মালতীকে আমি পছন্দ করি ভেবে মালতীকে রিণি ইতিপূর্বে দুচোখে দেখতে পারত না। একদিন নিজে থেকে যেচে আমার দিকে প্রত্যাশা করে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাথা খারাপ হবার গোড়াতে স্যার কে এল-এর কাছে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব কথা বলেছিল যে পরদিন তিনি আমায় ডেকে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন, কেন তার মেয়েকে বিয়ে করব না। এখন রিণি পাগল হয়ে গেছে, কারও কথা শোনে না, আমি যা বলি তাই মেনে নেয়। শুধু তাই নয়, অন্য সময় পাগলামি করে, আমি যতক্ষণ কাছে থাকি শান্ত হয়ে থাকে। আমার জন্য যে ও পাগল হয়েছে তার আর কত প্রমাণ চাও?

তোমার জন্য পাগল হওয়ার প্রমাণ ওগুলি নয় রাজু। শ্রদ্ধা ভয় বিশ্বাসের প্রমাণ, হয়তো ভালোবাসারও প্রমাণ।

হয়তো কেন?

ভালোবাসার কোনো ধরাবাঁধা লক্ষণ নেই রাজু!

রাজকুমার কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য মেয়ে সরসী। আমার বিবরণ শুনে অন্য কোনো মেয়ের এতটুকু সন্দেহ থাকত না রিণি আমায় ভালোবাসত আর মাথাটা ওর খারাপ হওয়ার কারণও তাই।

রিণি তোমায় ভালোবাসত কিনা জানি না রাজু, তবে সে জন্য ও যে পাগল হয়নি তা জানি। একপক্ষের ভালোবাসা কাউকে পাগল করে দিতে পারে না, যতই ভালোবাসুক। রিণির পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল। তোমায় যদি রিণি ভালোবেসে থাকে, মনে জোরালো ঘা খেয়ে থাকে, অন্য কারণগুলিকে সেটা একটু সাহায্য করে থাকতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। তোমার মতো সাইকলজির জ্ঞান নেই, তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি। ডাক্তারও তো বলেছেন, ধীরে ধীরে ইনস্যানিটি আসছিল। তোমার দায়িত্ব কীসের? তুমি কেন নিজেকে দোষী ভেবে মন খারাপ করছ? তার কোনো মানে হয় না।

ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সরসী শেষের দিকে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগ ও উত্তেজনা চিরদিন সরসীর চোখে মুখে অভিনব রূপান্তর আনিয়া দেয় এবং এই রূপান্তর তার ঘটে এত কদাচিৎ যে আগে কয়েকবার চোখে পড়িয়া থাকিলেও রাজকুমারের মনে হয় হঠাৎ সরসীকে ঘিরিয়া যেন অপরিচয়ের রহস্য নামিয়া আসিয়াছে।

আমি তো বললাম তোমায়, আমি জানি রিণি আমার জন্য পাগল হয়নি।

তবে তুমি এমন করছ কেন?

সরসীর প্রশ্নে রাজকুমার আশ্চর্য হইয়া গেল।

কেমন করছি?

একেবারে যেন ভেঙে পড়েছ তুমি। মুখ দেখে টের পাওয়া যায় ভয়ানক একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছ। সবাই বলাবলি করছে এই নিয়ে। তোমার কাছে এ দুর্বলতা আশা করিনি রাজু।

সত্যি কথা শুনবে সরসী? আমার মন ভেঙে গেছে।

কেন?

কেন তোমায় কী করে বুঝিয়ে বলব। আমি নিজেই ভালো করে বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয় আমার জীবনের কোনো সম্ভাবনা নেই, সার্থকতা নেই, আমি একটা ফাঁকি দাঁড়িয়ে গেছি। চিরদিন যেন ভাঙা-চোরা মানুষ ছিলাম মনে হয়, এখানে ওখানে সিমেন্ট করে বেঁধেছেঁদে আস্ত মানুষের অভিনয় করছিলাম, এতদিনে ভেঙে পড়েছি। চব্বিশ ঘন্টা নিজের কাছে লজ্জা বোধ করছি সরসী।

সরসী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলে, আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে পারো না রাজু? আমি যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলো।

রাজকুমার অনেকক্ষণ ভাবে। তার চোখ দেখিয়া সরসীর মনে হয়, মনের অন্ধকারে সে নিজের পরিচয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চোখে তার আলোর এত অভাব সরসী কোনোদিন দেখে নাই, এ যেন মুমূর্ষের চোখ। সরসী শিহরিয়া উঠে। হাতের মুঠি সে সজোরে চাপিয়া ধরে ঠোঁটে, চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। রাজকুমার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে প্রথম দিকের কথাগুলি সে শুনিতে পায় না।

রাজকুমার বলে, ঘুরিয়ে বলেও বোঝাতে পারব না সরসী। যদি বলি, ভেতর থেকে জুড়িয়ে যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি, ঠিক বলা হবে না। যদি বলি, বহুকাল থেকে আমি যেন ধীরে ধীরে স্যুইসাইড করে আসছি, তাও ঠিক বলা হবে না। আমার এই কথাগুলি কী ভাবে নিতে হবে জানো? গন্ধ বোঝাবার জন্য তোমায় যেন ফুল দেখাচ্ছি।

কী ভাবো তুমি? মোটা কথায় তাই আমাকে বলো।

কী ভাবি ? ভাবি যে আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কেন। কারও সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। অন্য সবাইকে দেখি, খুব যার সংকীর্ণ জীবন, তারও কয়েকজনের সঙ্গে সাধারণ সহজ সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তার বন্ধুত্বের, ঘৃণা বিদ্বেষের সম্পর্ক। কারও সঙ্গে আমার সে যোগাযোগ নেই। কী যেন বিকার আমার মধ্যে আছে সরসী, আর দশজন স্বাভাবিক মানুষ যে জগতে সুখে বিচরণ করে আমি সেখানে নিজের ঠাঁই খুঁজে নিতে পারি না। আমার যেন সব খাপছাড়া, উদ্ভট। নাড়ি দেখব বলে আমি গিরির সঙ্গে কেলেঙ্কারি করি, শুধু খেয়ালের বশে রিণি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমার কাছে

সেটা বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সৌন্দর্যর বদলে মেয়েদের দেহে আমি খুঁজি আমার থিয়োরির সমর্থন। আমার যেন সব বাঁকা, সব জটিল। বুঝতে পার না সরসী তোমাদের সঙ্গেও আমার যোগাযোগটা কী রকম? তুমি কখনও আমার বিচার কর না, শুধু আমায় বুঝবার চেষ্টা কর, তোমার সঙ্গে তাই প্রাণ খুলে কথা বলি। শুধু ওইটুকু সম্পর্ক তোমার সঙ্গে আমার। আমার সঙ্গে শুধু আমার কথা তুমি বলবে, তোমার যেন আর কাজ নেই। তোমার সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল কোনোদিন দেখেছ আমার? তোমার সুখ দুঃখের ভাগ নেবার আগ্রহ দেখেছ কখনও? আমার প্রয়োজনে আমার জন্য তুমি একদিন আশ্চর্য সাহস আর উদারতা দেখালে তাই জানতে পারলাম তোমার দেহ মন কত সুন্দর। কিন্তু কৃতজ্ঞতা কই আমার?

কৃতজ্ঞতা চাইনি রাজু।

তুমি না চাও, আমার তো স্বাভাবিক নিয়মে কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত ছিল? ওটা যেন আমার প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছি। তাহলেই দ্যাখো, তুমি যে আমার কাছে এসেছ সেটা শুধু বিনা বিচারে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে তোমার গ্রহণ করার চেষ্টার পথে, অন্তরঙ্গতার পথে নয়। অন্য কেউ হলে আপনা থেকে তোমাকে বুঝবার চেষ্টা করত, পরস্পরের জানা বোঝার চেষ্টায় সৃষ্টি হত সুন্দর স্বাভাবিক বন্ধুত্ব। আমার সেটা কোনোদিন খেয়াল পর্যন্ত হয়নি।

তুমি আমায় কখনও উপেক্ষা করনি রাজু।

কেন করব? আয়নাকে কেউ উপেক্ষা করে না।

সরসী নতমুখে নিজের আঙুলের খেলা দেখিতে থাকে। আঁচলের প্রান্ত নয়, কোলের কাছে জড়ো করা কাপড়ের খানিকটা পাকাইয়া কখন সে যেন আঙুল জড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাগ করলে সরসী? স্পষ্ট করে বললাম বলে?

সরসী মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। রাগ করেছিলাম। তুমি জিজ্ঞেস করলে বলে আর রাগ নেই। রাগ করি আর নাই করি তুমি স্পষ্ট করেই বলো—যত স্পষ্ট করে পার।

রাজকুমার বলে, তোমার কথা আর বলব না। এবার মালতীর কথা বলি। মালতীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে জানো? শ্রদ্ধাকে ভালোবাসা মনে করার সম্পর্ক। সোজাসুজি ভালোবাসলে হয়তো ওকে কাছে আসতে দিতাম না, ভুলেই থাকতাম মালতী বলে একটা মেয়ে এ জগতে আছে। কিন্তু ভিত্তিটা যখন ভুলের, দুদিন পরে ভুল ভেঙে যাবে যখন জানি, জটিল একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হতে দিতে আমার বাঁকা মনের আপত্তি হবে কেন? তার পর ধরো রিণি—

সরসী চেয়ারে পিছনে হেলান দিয়াছিল, সোজা হইয়া বসে। বুঝা যায় মালতীর চেয়ে রিণির কথা শুনিতেই তার আগ্রহ বেশি।

রিণি যতদিন সুস্থ ছিল, আমার সঙ্গে বনত না। আমি কাছে গেলেই যেন কঠিন

হয়ে যেত। পাগল হয়ে এখন রিণি সকলকে ত্যাগ করে আমায় আশ্রয় করেছে, আমি ছাড়া ওর যেন কেউ নেই। আগে ওকে আমার পছন্দ হত না, এখন ওর জন্য আমার মন কাঁদে। বিশ্বাস করতে পার সরসী? এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছ কোনোদিন? সাধারণ রিণির সঙ্গে নয়, পাগল রিণির সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

সরসী বলে, সৃষ্টিছাড়া কথা বলছ কেন? পাগল হয়েছে বলেই তো রিণির জন্য তোমার মমতা জাগা স্বাভাবিক।

রাজকুমার বলে, আমার নয় মমতা জাগল। কিন্তু রিণি? আমি এমন খাপছাড়া মানুষ যে পাগল হয়ে তবে রিণি আমায় সইতে পারল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর কথা বলে না? রিণি আমায় তাই দেখিয়েছে সরসী। সুস্থ মনে আমায় বন্ধু বলে ও গ্রহণ করতে পারেনি, বিকার শুধু আমায় চিনেছে।

সরসী কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলে, তাও যদি হয়, কথাটা তুমি ও ভাবে নিচ্ছ কেন? খাপছাড়া হওয়াটা সব সময় নিন্দনীয় হয় না রাজু। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিন্তাশীল প্রতিভাবান মানুষের খাপ না খাওয়াটাই বেশি স্বাভাবিক। সুস্থ অবস্থায় রিণি হয়তো তোমার নাগাল পেত না, তোমার ব্যক্তিত্ব ওকে পীড়ন করত, তাই ও তোমায় সহ্য করতে পারত না। পাগল হয়ে এখন আর ও সব অনুভূতি নেই, তোমায় তাই ওর ভালো লাগে, বিনা বাধায় তোমায় শ্রদ্ধা করতে পারে।

রাজকুমার ম্লানভাবে একটু হাসে। বলে, চিন্তাশীল। প্রতিভাবান মানুষ। চিন্তাগ্রস্ত নিউরোটিক মানুষ বললে লাগসই হত সরসী। যত চেষ্টাই কর, আমার ট্র্যাজেডিকে আমার মহাপুরুষত্বের প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে পারবে না, সরসী। নিজেকে আমি কিছু কিছু চিনতে পারছি।

সরসীর মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয়, রাজকুমারের বাহুমূল চাপিয়া ধরিয়া সে বলে, পারছ? তাই হবে রাজু। তাই হওয়া সম্ভব। নিজেকে জানবার বুঝবার চেষ্টা আরম্ভ করে তুমি দিশেহারা হয়ে গেছ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম তোমার কী হয়েছে।

সমুদ্রের সংকেতে প্রতি বছর রাজকুমারের সালতামামি হয়। দূরের সমুদ্র শহরে তার কাছে আসে। জীবনের কয়েকটা দিন ভরিয়া থাকে ভিজা স্পর্শ, আঁশটে গন্ধ আর বালিয়াড়ির স্বপ্ন। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হয়, দীর্ঘকায়া চম্পকবর্ণা এক নারী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মাঠ বন নদী গ্রাম নগর পার হইয়া আগাইয়া আসিতেছে, শ্রেণিভারে থমথম করিতেছে তার। গগনচুম্বী রসটম্বুর দেহে স্তম্ভিত ছন্দের ঢেউ, কটিতটে সৃষ্টি হইয়াছে নতুন দিগন্তের বঙ্কিম রেখা, মুখ ঘিরিয়া খেলা করিতেছে নিশ্বাসে আলোড়িত মেঘ। মনে হয়, আসিতেছে।

পাড়ার একটি ছেলে প্রায় প্রতি রাত্রে বাঁশি বাজায়, রাজকুমার শুধু শুনিতে পায় এই কয়েকটা দিন। একতলায় রোয়াকে আর দোতলার বারান্দায় আস্ত ভাঙা কয়েকটি টবের ফুলগুলি চোখে পড়ে, খেয়াল হয় যে পাতার রং সত্যই সবুজ। তবু সে বিশ্বাস করে

না, মানিতে চায় না যে প্রত্যেক জীবনে আশীর্বাদ থাকিবেই, আশীর্বাদ কখনও ধ্বংস হয় না। নিজেকে সে ধমক দিয়া বলে, আমি অভিশপ্ত। বলে আর তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেয় সালতামামির সংকেত ও নববর্ষের প্রেরণা।

ভাবিয়া রাখে, ঘনিষ্ঠভাবে কারও সংস্পর্শে সে আর আসিবে না, কারও জীবনে তার অভিশাপের ছায়া পড়িতে দিবে না। ভগবান জানেন তাকে কেন ওরা শ্রদ্ধা করে, তার প্রভাব ওদের জীবনে কাজ করে কেন। কিন্তু আর নয়। তার সঙ্গে মেলামেশা সহজ ও সহনীয় করিতে ওদের যখন বিকার আনিতে হয় নিজেদের মধ্যে, তার কাজ নাই মেলামেশায়। অন্য কারও সঙ্গে নয়, কালী মালতী আর সরসীর সঙ্গেও নয়।

মনোরমাকে সে বলে, কালীকে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দাও দিদি।

খোকা পাশে ঘুমাইয়া আছে, মনোরমার কোনো অবলম্বন নাই। মাথা নিচু করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলে, গোড়াতেই কেন বললে না রাজুভাই? একটা কচি মেয়ের সঙ্গে খেলা করতে মজা লাগছিল? বিয়ের যুগ্যি কনের জন্য একটা বর গাঁথতে তার মতলববাজ দিদি কেমন করে ফাঁদ পাতে সেই রগড় দেখছিলে?

না, দিদি, গোড়া থেকে কালীকে আমার ভালো লেগেছিল।

মুখ তুলিয়া সাগ্রহে মনোরমা বলে, তবে?

রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আগ্রহ তার আপনা হইতে ঝিমাইয়া যায়। আবার মুখ নিচু করিয়া খোকার বালিশ হইতে একটি পিঁপড়ে ঝাড়িয়া ফেলে, ধীরে ধীরে মেঝেতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলে, তোমার দোষ নেই রাজুভাই, আমারই বোকামি হয়েছে। নিজের ইচ্ছেটাই আমি বড়ো করে দেখছিলাম। যদি বলি কালীর বিয়ের ভাবনা আমাদের ছিল না, বিশ্বাস করবে রাজুভাই? তুমি তো দেখে এসেছ, ওর বাবার অকথা খারাপ নয়। মেয়েটাকে সস্তায় তোমার ঘাড়ে চাপানো যাবে বলে চেষ্টা করিনি ভাই।

তা জানি দিদি। ও কথা আমার মনেও আসেনি।

ওর বয়সে আমিও ওর মতো হাবাগোবা মেয়ে ছিলাম রাজুভাই।

কালী হাবাগোবা মেয়ে নয় দিদি। বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, পাকামি নেই বলে হাবাগোবা মনে হয়।

মনোরমা যেন শুনিয়াও শোনে না, আপন মনে বলিতে থাকে, এমন ঝোঁক আমার কেন চাপল কে জানে। দিনরাত কেবল মনে হত, তোমার সঙ্গে ভাব হবে, বিয়ে হবে, কালীর জীবন সার্থক হবে, আমারও সুখের সীমা থাকবে না। মস্ত একটা ভার যেন নেমে যাবে মনে হত।

মনোরমাকে দেখিলে চমক লাগিয়া যায়। বিষাদ ও হতাশার যন্ত্রণায় মুখ যেন তার কালো হইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। কালীর বদলে তাকেই যেন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে রাজকুমার, বুক তার ভাঙিয়া গিয়াছে, হাড়-পাঁজর সমেত। মমতা বোধ করার বদলে তাকে

রাজকুমারের আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়। তার সংস্পর্শে আসিয়া তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে কালীর মধ্যস্থতায় নিজের মনের আবছায়া গোপনতার অন্তরালবর্তিনী মনোরমা তার সঙ্গে কী অদ্ভুত যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়াছে দ্যাখো।

কালীর আবির্ভাবের আগের ও পরের মনোরমার অনেক তুচ্ছ কথা, ভঙ্গি ভাব ও চাহনি, অনেক ছোটোবড়ো পরিবর্তন, রাজকুমারের মনে পড়িতে থাকে। মনে পড়িতে থাকে, শেষের দিকে তার সমাদর ও অবহেলায় কালীর মুখে যে আনন্দ ও বিষাদের আবির্ভাব ঘটিত, কতবার মনোরমার মুখে তার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছে। কালীর চেয়েও মনোরমার প্রত্যাশা ও উৎকণ্ঠা মনে হইয়াছে গভীর।

মনোরমা মরার মতো বলে, আমি ভাবছি ও ছুঁড়ি না সারাটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরে। এ আমি কী করলাম রাজুভাই?

মনোরমা পর্যন্ত বিকারের অর্ঘ্য দিয়া নিজের জীবনে তাকে অভ্যর্থনা করিয়াছে, ও জ্বালা রাজকুমার ভুলিতে পারিতেছিল না। অশ্রুজলের ইতিহাস হয়তো আছে, নিপীড়িত বন্দী-মনের স্বপ্ন-পিপাসা হয়তো প্রেরণা দিয়াছে, তবু রাজকুমার মনোরমাকে ক্ষমা করিতে পারে না, নিষ্ঠুরভাবে ধমক দিয়া বলে, কী বকছ পাগলের মতো? কালী তোমার মতো কাব্য জানে না দিদি। দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দেবে, তোমার ভয় নেই।

মনোরমা বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া থাকে। রাজকুমার আঘাত করিলেও সে বুঝি এতখানি আহত হইত না। দুদিন পরে নিজেই সে কালীকে তার মার কাছে রাখিয়া আসিতে যায়। আর ফিরিয়া আসে না। মাসকাবারে তার স্বামী বাসা তুলিয়া দিয়া সাময়িকভাবে আশ্রয় নেয় বোর্ডিং-এ।

রাজকুমার বুঝিতে পারে যে সোজাসুজি তার বাড়ি ছাড়িয়া অন্য বাড়িতে উঠিয়া যাইতে মনোরমা সংকোচ বোধ করিয়াছে। বোর্ডিং-এর ভাত খাইয়া স্বামী তার রোগা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া দু-এক মাস পরেই মনোরমা শহরে অন্য বাড়িতে নীড় বাঁধিবে। হয়তো কালীর শুভবিবাহের পর। ইতিমধ্যে যদি কালীর বিবাহ নাও হয়, কয়েক-মাসের মধ্যে হইবে সন্দেহ নাই। মনোরমা তখন একদিন এ বাড়িতে আসিবে, কালীর বিবাহে তাকে নিমন্ত্রণ করিতে।

আঘাত করিতে আসিয়া মনোরমার চোখ যদি সেদিন হঠাৎ ছলছল করিয়া ওঠে? বিষাদ ও হতাশায় আবার যদি মুখখানা তার কালো আর বাঁকা হইয়া যায়? রোমাঞ্চকর বিষাদের অনুভূতিতে রাজকুমারের সর্বাঙ্গে শিহরন বহিয়া যায়।

মালতীর সঙ্গে তার প্রায় দেখাই হয় না। মালতীও সাড়াশব্দ দেয় না। সরসীর কাছে রাজকুমার তার খবর পায়। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাইবে জানিলেও মালতীর সম্বন্ধে রাজকুমারের ভাবনা ছিল। আপনা হইতে সব ঠিক হইয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো সহজ বা সংক্ষিপ্ত হইবে না মালতীর পক্ষে, কষ্টকর দীর্ঘ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাকে কতদিন কাটাইতে হইবে কে জানে। তার সাহায্য পাইলে এই দুঃখের দিনগুলি হয়তো

মালতীর আরেকটু সহনীয় হইত কিন্তু সে সাহস আর রাজকুমারের নাই। নিজের সম্বন্ধে তার একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গিয়াছে। কয়েকটা দিন অত্যন্ত উদ্‌বেগের মধ্যে কাটাইয়া একদিন সে সরসীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিল। অকপটে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া প্রায় করুণ সুরে প্রশ্ন করিয়াছিল, কী করি বল তো সরসী?

সরসী বলিয়াছিল, তোমার কিছু করতে হবে না। আমি সব ঠিক করে নেব।

রাজকুমার চিন্তিতভাবে বলিয়াছিল, সেটা কি ঠিক হবে সরসী? যা বলার আমার বলাই উচিত, আমার হয়ে তুমি কিছু বলতে গেলে হয়তো খেপে যাবে। এমনিই কী হয়েছে কে জানে, একদিন ফোন পর্যন্ত করল না। যখন তখন ফোনে কথা বলতে পারবে বলে জোর করে আমাকে বাড়িতে ফোন নিইয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না, সরসী।

এমন অসহায় নম্রতার সঙ্গে রাজকুমারকে সরসী কোনোদিন কথা বলিতে শোনে নাই। ধরা গলার আওয়াজ রাজকুমারকে শোনাইতে না চাওয়ায় কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারে নাই।

তুমি কিছু ভেবো না রাজু। তোমার হয়ে মালতীকে বলতে যাব কেন? যা বলার আমি নিজে বলব, যা করার আমি নিজেই করব। এসব মেয়েদের কাজ, মেয়েরাই ভালো পারে। আমায় বিশ্বাস কর, আমি বলছি, মালতীর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। মালতী চুপ করে গেছে কেন বুঝতে পার না? ওর ভয় হয়েছে।

কীসের ভয়?

তুমি যদি সত্যি সত্যি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চাও? এই ভয়। সেদিন নিজে থেকে তোমায় বলেছিল বটে, এখন কিন্তু ওর ভেতর থেকে উলটো চাপ আসছে। যেতে বললে যাবে কিন্তু ওর উৎসাহ নিভে গেছে। সেদিন হোটেলের রুমে যেমন বুঝতে পারেনি হঠাৎ কেন অসুস্থ হয়ে পড়ল, এখনও বেচারি সেই রকম বুঝতে পারছে না কী হয়েছে, অথচ তোমায় একবার ফোন করার সাহসও হচ্ছে না।

সরসী মালতীর ভার নেওয়ায় রাজকুমার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সরসীর উপর সে নির্ভর করিতে শিখিতেছিল, সব বিষয়ে সরসীর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা ও পরামর্শ করার প্রেরণাও তার এই মনোভাব হইতে আসিয়াছে। তাকে রিণির প্রয়োজন, তাই শুধু উন্মাদিনী রিণির সাহচর্য স্বীকার করিয়া সকলের জীবন হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছে, বাদ পড়িয়াছে সরসী। সরসীকেও সে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিল, মুক্তি পাইতে সরসী অস্বীকার করিয়াছে। রাজকুমার তাকে ডাকে না, সরসী নিজেই তার কাছে আসে, বাড়িতে না পাইলে স্যার কে এল-এর বাড়ি গিয়া তার খোঁজ করে। রিণি তাকে সহ্য করিতে পারে না, নীচে বসিয়া রাজকুমারের সঙ্গে সে কথা বলে। বারবার রিণি তাদের আলাপে বাধা দেয়, রাজকুমারকে উপরে ডাকিয়া অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখে, সরসী ধৈর্য হারায় না, বিরক্ত হয় না, অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মনে হয় সে যেন সকলকে রেহাই দেয় নাই, তাকেই সকলে পরিত্যাগ

করিয়াছে, একমাত্র সরসী তাকে ছাঁটিয়া ফেলে নাই, আরও তার কাছে সরিয়া আসিয়াছে।

স্যার কে এল-এর বাড়িতেই রাজকুমারের বেশির ভাগ সময় কাটে রিণির কাছে। রাজকুমার না থাকিলে রিণি অস্থির হইয়া ওঠে, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের চুল ছেঁড়ে, রাগ করিয়া আলমারির কাচ, চীনামাটির বাসন ভাঙে বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, ধরিতে গেলে মানুষকে কামড়াইয়া দেয়, জামাকাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন দেহে রাজকুমারের খোঁজে বাহির হইয়া যাইতে চায় পথে। রাজকুমারকে দেখিলেই সে একেবারে শান্ত হইয়া যায়, আশ্চর্যরকম শান্ত হইয়া যায়। প্রায় স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতো কথা বলে ও শোনে, চলাফেরা করে, খাবার খায়, ঘুমায়। একটু তফাৎ হইতে লক্ষ করিলে অজানা মানুষের তখন বুঝিবার উপায় থাকে না তার কিছু হইয়াছে। কোনো কোনো মুহূর্তে রাজকুমারের পর্যন্ত মনে হয় যে রিণি বুঝি সারিয়া উঠিয়াছে, একটা চমক দেওয়া উল্লাস জাগিতে না জাগিতে লয় পাইয়া যায়। রিণির চোখ। রাজকুমার যত কাছেই থাক, যতই সুস্থ ও শান্ত মনে হোক রিণিকে, দুটি চোখের চাহনি রিণির ক্ষণিকের জন্যও স্বাভাবিক হয় না।

প্রথম দিকে রাত্রে রিণিকে ঘুম পাড়াইয়া রাজকুমার নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু দেখা গেল এ ব্যবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া রিণি হইচই সৃষ্টি করিয়া দেয়, কেউ তাকে সামলাইতে পারে না, শেষ পর্যন্ত রাজকুমারকে ডাকিয়া আনিতে হয়। রাত্রেও রাজকুমারকে তাই এ বাড়িতে শোয়ার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

স্যার কে এল কিছু বলেন নাই। রাজকুমার নিজেই তার কাছে প্রস্তাব করিয়াছিল।

আপনার আপত্তি নেই তো?

না।

লোকে নানা কথা বলবে।

বলুক।

রাত্রে মাথার কাছে বিছানায় বসিয়া শিশুর মতো গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া রিণিকে সে ঘুম পাড়াইল, তারপর নিজের ঘরে যাওয়ার আগে কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া নেওয়ার জন্য আরেকবার গেল স্যার কে এল-এর ঘরে।

আপনি যদি ভালো মনে করেন, রিণিকে আমি বিয়ে করতে রাজি আছি।

কেন?

আপনি তো বুঝতে পারছেন, প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতোই আমাদের দিনরাত একত্র থাকতে হবে— কতকাল ঠিক নেই।

রাজু, স্ত্রী পাগল হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে।

তবু আপনার মনে যদি—

আমার মনে কিছু হবে না রাজু। শুধু মনে হবে তুমি রিণিকে সুস্থ করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছ। সেদিন বলিনি তোমাকে, রিণিকে আমি তোমায় দিয়ে দিয়েছি?

তোমাকে ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলবে না, আমার পাগল মেয়ের জন্য তুমি সব ত্যাগ করবে আর আমি নীতির হিসাব করতে বসব? তোমাকে আমি বাঁধতে চাই না রাজু। আমি চাই যখন খুশি তোমার চলে যাবার পথ খোলা থাকবে। তুমি ভিন্ন ঘরে বিছানা করেছ, দরকার হলে রিণির ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন নেই। আমার মেয়েকে তুমি ভালো করে দাও, আমি আর কিছু চাই না, রাজু।

সরসীও এই কথাই বলিল রাজকুমারকে। বলিল যে রিণির সঙ্গে রাজকুমারের এই ঘনিষ্ঠতা তার কাছেও যখন এতটুকু দোষের মনে হইতেছে না, রাজকুমারেরও সংকোচ বোধ করার কারণ নাই। জীবন তো খেলার জিনিস নয় মানুষের।